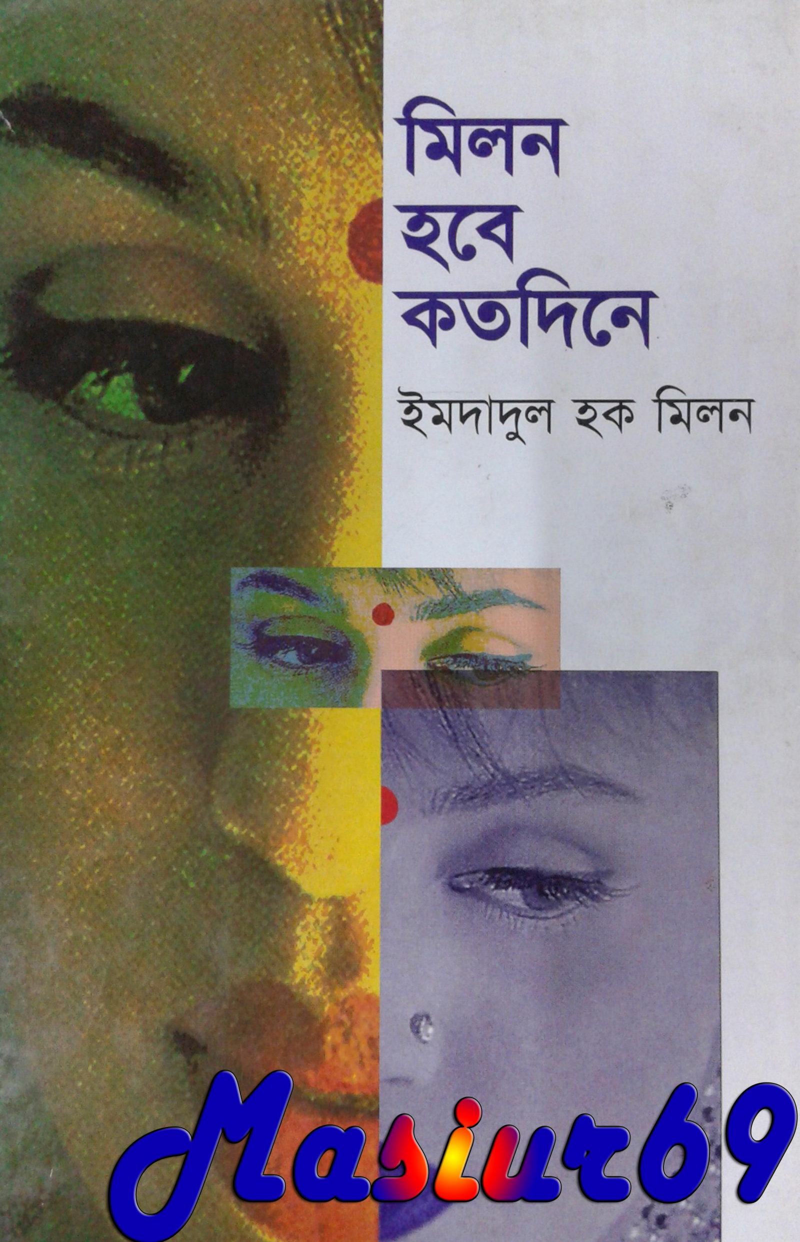

মিলন হবে কতদিনে

ইমদাদুল হক মিলন

Masiur69

Help Us To Keep Banglapdf.net Alive!
Please Give Us Some Credit When You Share Our Books!
Don't Remove This Page!
Visit Us at Banglapdf.net
If You Don't Give Us Any Credits, Soon There ll Nothing Left To Be Shared!

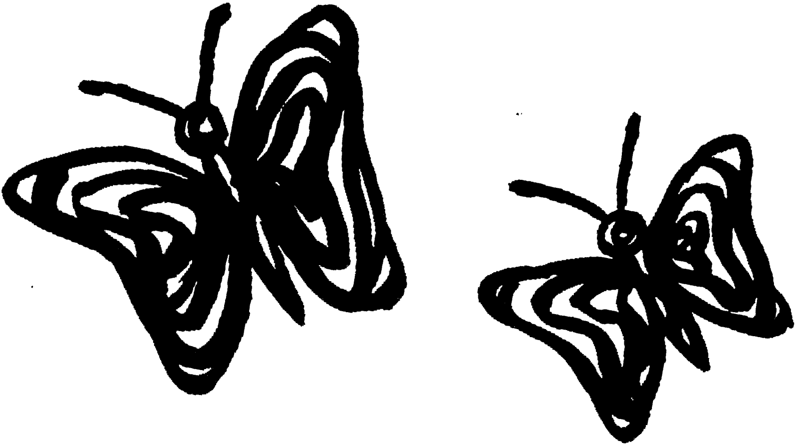

মিলন হবে কত দিনে

ইমদাদুল হক মিলন

অন্যপ্রকাশ

কবরেজ বাড়ির গাছপালা আকুল হয়েছে চৈত্র দিনের উদাস হাওয়ায়। বাড়ির পেছন দিককার বাঁশবন হা হা করছে। বাঁশবনের মাথার ওপরকার আকাশ ভেসে যাচ্ছে দুপুর বেলার স্বচ্ছ রোদে। বারবাড়ি আড়াল করে রাখা ঝাকড়া মাথার কামরাঙা গাছটি পুরনো পাতা ঝড়িয়ে টিয়ে পাখি রঙের নতুন পাতায় মনোরম হয়েছে। নরম কোমল নিরীহ এক আবরণে যেন নিজেকে একেবারে অচেনা করে ফেলেছে। ঝিরঝিরে হাওয়ায়, মুগ্ধ আবেশে গাছটি যেন আজ মগ্ন।

এই কামরাঙার পাতা আর আলতার শাড়ির রঙ যে আজ কেমন করে একাকার হল!

কামরাঙাতলা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই ব্যাপারটা খেয়াল করল আলতা। নিজের অজান্তেই যেন দাঁড়াল। মুখ তুলে কামরাঙা গাছের দিকে তাকাল, নিজের দিকে তাকাল। সকাল থেকে ভার হয়ে থাকা বুকটা তারপর হঠাৎ করেই যেন হালকা হয়ে গেল। কেন হল কে জানে! তবে বুক কাঁপিয়ে দীর্ঘ একটা শ্বাস পড়ল আলতার।

কবরেজ বাড়ির ভেতর থেকে মবিন কবরেজের হামানদিস্তা ঠোকার শব্দ আসছে। গাছের শেকড় বাকড় ছাল বাকল লতাপাতা বীজ কিংবা শুকনো ফল, ফলের রস, মধু ইত্যাদি হামানদিস্তায় ফেলে নিজ হাতে অষুদ তৈরি করছেন মবিন কবরেজ। হাওয়ায় ভাসছিল মিঠেল একখানা ভেষজ গন্ধ।

কবরেজ বাড়ির ছোট মেয়ে পারু যাচ্ছিল রান্না ঘরের দিকে। কামরাঙা তলায় আলতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চঞ্চল পায়ে ছুটে এল। আলতাবু, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ! আস, বাড়িতে আস।

আলতা গম্ভীর গলায় বলল, না। এখন আর তোদের বাড়িতে ঢুকব না।

পারু গাল ফোলাল। আমাদের বাড়িতে তুমি কোনও দিনও বেশি আস না। বাড়ির পাশ দিয়ে যে বাড়িতে যাওয়ার সেই বাড়িতে যাও।

পারুর কথাটা বুঝল আলতা। বুঝেও না বোঝার ভান করল। বলল, কোন বাড়িতে যাই আমি!

তা আর শোনবার দরকার নেই। তুমি তো জানই।

আলতা একটু রাগল। না আমি জানি না। তুই বল।

পারু বেশ অবাক হল। তুমি এত রেগে আছ কেন গো!

অবাক কিংবা মুগ্ধ হলে গো কথাটা প্রায়ই বলে পারু। শুনতে খুব মিষ্টি লাগে। মন ভাল হয়ে যায়।

আলতার মনটাও বুঝি ভাল হল। পারুর কাঁধে হাত দিল সে। হাসল। তোর এই গো কথাটা শোনার জন্য রেগেছি। এই যে একবার শুনলাম এখন আর রাগব না।

পারুও হাসল এবার। তুমি যে কী!

তারপর আলতার একটা হাত ধরল পারু। বাড়িতে আস আলতাবু। তোমার সঙ্গে গল্প করি।

না আজ না।

কেন?

আজ আমার মনটা ভাল নেই।

মন ভাল নেই কেন? আজ যে তোমার মন বেশি ভাল থাকার কথা।

আলতা অবাক হল, কেন? মন বেশি ভাল থাকার কথা কেন?

আজ তোমাকে দেখতে আসবে না!

তোকে কে বলল! তুই কোথায় শুনলি!

এসব কথা চাপা থাকে না। পাশাপাশি তিনটি বাড়ি আমাদের। প্রথমে তোমাদের বাড়ি তারপর এই আমাদেরটা তারপর মনজু ভাইদেরটা। তিন বাড়ির যে কোনও বাড়ির যে কোন কথাই

হাওয়ায় ভেসে অন্য বাড়িতে চলে আসে। আমার কাছেও হাওয়ায় ভেসে এসেছে। বল কথাটা ঠিক না? আজ তোমাকে দেখতে আসবে না?

আলতা কথা বলল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

আবার আলতার হাত ধরল পারু। বল না গো!

পারুর বয়স এগারো বারো বছর। লম্বা, রোগা মতো। তবে গায়ের রঙটা খুব সুন্দর পারুর। শবরি কলার মতো। মুখটা খুব মিষ্টি। এই বয়সী মেয়েদের, মেয়েদের জীবন বিয়ে ইত্যাদি নিয়ে বাড়তি একটা আগ্রহ জন্মে। পারুরও জন্মেছে। পারুর চোখের ঝিলিকে তা বোঝা যায়।

আলতা বলল, আমার মন ভাল না থাকার কারণ তুই বুঝবি না।

পারু সঙ্গে সঙ্গে বলল, বুঝব না কেন? আমি বড় হয়েছি না?

তীক্ষ্ণ চোখে পারুকে এবার দেখল আলতা। কোথায় বড় হয়েছিস? এখনও তো ফ্রক প্যান্ট পরছিস। বড় হলে সালোয়ার কামিজ পরে মেয়েরা। শাড়ি পরে।

ফ্রক প্যান্ট পরেও বড় হওয়া যায়। আমি হয়েছি। তুমি বল।

আলতা কথা বলল না। আনমনা হল।

আড়চোখে একবার আলতাকে দেখল পারু। তারপর ঠোঁট টিপে হাসল। আমি কিন্তু সত্যি বুঝেছি তোমার কেন মন ভাল নেই। তোমার কেন মন খারাপ।

আলতা আনমনা গলায় বলল, কেন বল্ তো!

যারা তোমাকে দেখতে আসবে তারা তোমাকে পছন্দ করবে কিনা! এসব কথা তুমি খুব ভাবছ। এসব ভেবেই মন খারাপ করছ!

ভেতরে ভেতরে বেশ একটা ধাক্কা খেল আলতা। যারা দেখতে আসবে তারা তাকে পছন্দ করবে কি করবে না ওসব সে ভাবেইনি। বরং না পছন্দ করলেই ভাল। বিয়ে পিছিয়ে গেলেই ভাল। আসলে আলতার মন খারাপ অন্য কারণে। সেই কারণটা সে ছাড়া এই পৃথিবীর আর কেউ জানে না। যার জন্য মন খারাপ সে নিজেও না। জানার অবশ্য কথাও নয়।

যাহোক পারু যখন বলছিল তখন একটু চিন্তিত হয়েছিল আলতা।

তাহলে কি কেউ কিছু আঁচ করেছে। টের পেয়ে গেছে আলতার মন রহস্য!

কিন্তু পারু যখন সেই কারণের ধার দিয়ে না গিয়ে অন্য কথা বলল, আলতার বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল।

অকারণেই মুখটা একটু বিষণ্ন করল সে। ঠিকই বলেছিস! এই কারণেই মন খারাপ আমার। ইস্ কেন যে দেখতে এত পঁচা হলাম আমি!

পারু সঙ্গে সঙ্গে মুখিয়ে উঠল। কে বলেছে তুমি দেখতে পঁচা!

পঁচা না! গায়ের রঙটা কেমন কালো আমার!

গায়ের রঙ কালো হলে কী হবে, চেহারা তো খুব সুন্দর তোমার! মাথায় কী সুন্দর চুল! চোখ দুটো টানা টানা। হিন্দুদের পূজোর জন্য দেবী বানালে সেইসব দেবীর যেমন চোখ হয়, তোমার চোখ ঠিক তেমন। তোমার হাসি খুব সুন্দর। হাসলে দারুণ লাগে তোমাকে। মেয়ে হিসেবে তুমি বেশ লম্বা। মোটাও না আবার আমার মতো রোগাও না তুমি। তোমার মতো মেয়েদেরকেই তো পুরুষ মানুষরা বেশি পছন্দ করে।

পারুর কথা শুনতে খুব ভাল লাগছিল আলতার। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সে খুবই অবাক হচ্ছিল। এই এতটুকু একটি মেয়ে মেয়েদের সৌন্দর্য এবং পুরুষদের পছন্দ ইত্যাদি নিয়ে এভাবে কথা বলছে কী করে! এতসব সে কেমন করে জানল!

চিন্তিত চোখে পারুর দিকে তাকাল আলতা। আশ্চর্য ব্যাপার তো!

পারু অবাক হল। আশ্চর্য ব্যাপার মানে?

তুই এভাবে কথা বলছিস কী করে?

কথাটা বুঝল না পারু। বলল, কী ভাবে?

মেয়েদের নিয়ে, পুরুষদের নিয়ে এত পাকা পাকা কথা! এসব তো আমাদের বয়সী মেয়েদের জানার কথা। এমন কি আমাদের বয়সী অনেক মেয়েও জানে না।

তারা হয়ত মনের দিক দিয়ে বড় হয়নি। অথবা এসব নিয়ে ভাবে না। আমি কিন্তু ভাবি। ভাবি বলেই জানি। তাছাড়া মনের দিক দিয়ে আমি কিন্তু সত্যি অনেক বড় হয়েছি।

তাতো বুঝতেই পারছি। বুঝে অন্য একটা কথা ভাবছি।

কী কথা?

আমার জায়গায় তোকে আজ বসিয়ে দেব কী না!

মানে?

মানে আমাকে যারা দেখতে আসবে, আমার জায়গায় তুই বসলে কণে হিসেবে তোকেই তারা দেখে গেল।

পারুল বেশ লজ্জা পেল। মাথা নিচু করে বলল, যাহ্।

যাহ্ কেন? তুই যখন এত কিছুই জানিস তাহলে তোকে বিয়ে দিতে অসুবিধা কী! তাছাড়া তুই দেখতে আমার চে' অনেক বেশি সুন্দর। তোর গায়ের রঙটার কোনও তুলনা হয় না।

শুধু রঙ দিয়ে কাজ হয় না।

তাহলে কী দিয়ে কাজ হয়?

মেয়েদের বংশ, টাকা পয়সা, বাপ দাদার নাম টামও লাগে। ওসব তোমাদের আছে। আমাদের নেই। আমাদের গ্রামে দুটো বংশের খুব নাম চৌধুরী আর তালুকদার। মনজু ভাইরা চৌধুরী। তবে তাদের শুধু বংশ গৌরবটাই আছে। টাকা পয়সা নেই। হদ্দ গরিব। মনজু ভাইকে ছাত্র পড়িয়ে চলতে হয়। এজন্য তাঁদের বংশের নাম সেভাবে লোকে আজকাল নেয় না। তোমাদেরটা নেয়। কারণ ভাল বংশের সঙ্গে ভাল টাকাও তোমাদের আছে। প্রচুর জমি-জমা আছে।

একটু থামল পারু। তারপর বলল, আসলে বংশ টংশর চেয়ে আজকাল টাকা পয়সারই বেশি দাম। বংশ না থেকে টাকাও যদি থাকে, টাকাঅলা লোকদের মেয়েদের ভাল ঘরে ভাল করে বিয়ে হয়; টাকা না থাকলে হয় না। যেমন আমার বড় বোনের হয়নি। আমার বোন সখিবুর মতো সুন্দরী মেয়ে এই বেসনাল গ্রামে ছিল না। যে দেখত সেই সখিবুকে পছন্দ করত। কিন্তু আমার বাবা গরিব কবিরাজ। তার টাকা পয়সা নেই। এজন্য সখিবুর বিয়ে হল এক দর্জির সঙ্গে।

আলতা বলল, আজকাল ভাল দর্জির অনেক দাম। হাজার হাজার, লাখ লাখ টাকা রোজগার করে তারা। সখির জামাইও তো ভাল দর্জি। শুধু ভাল না। খুবই ভাল। নারায়ণগঞ্জে এক দোকানে কাজ করত। সেই দোকানের কাজ ছেড়ে নিজে ছোট একটা দোকান দিল। তারপর সাত বছর কেটে গেছে। এই সাত বছরে ওই ছোট দোকান থেকে তিনটা বড় দোকান করেছে। নারায়ণগঞ্জের বাবুরাইলে দোতলা বাড়ি করেছে। দুই ছেলেমেয়ে ইংলিশ স্কুলে পড়ে। তাহলে দর্জি আর খারাপ হল কী করে?

না খারাপ এখন কেউ আর দুলা ভাইকে বলে না। কিন্তু বিয়ের সময় আমাদের আত্মীয় স্বজনরা অনেকে অনেক কথা বলেছে। সখিবু নিজেও বিয়েতে রাজি ছিল না। বিয়ের পর অনেক দিন পর্যন্ত দুলাভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না।

এখন?

এখন তো দারুণ খাতির দুজনে। একজন আরেকজনকে ছাড়া ভাত খায় না। দুলাভাইর টাকা হল

বুবুও তার সঙ্গে খাতির করতে শুরু করল। এসব শুনে বাবা মিট মিট করে হাসে। কম কথা বলার লোক তো। কথা বলে না। শুধু হাসে। কথা বলে মা।

কী বলে?

বলে সখির জামাইর টাকা হয়েছে সখির ভাগ্যে। বিয়ের পর ভাগ্য বদলে গেছে জামাইর।

একটু থেমে পারু বলল, সত্যি আলতাবু, মেয়ের ভাগ্যে কী জামাইর ভাগ্য বদলায়?

কথাটার জবাব দিল না আলতা। পারুও ওই নিয়ে আর কথা বলল না। বলল অন্য কথা। তোমার জায়গায় আমাকে বসিয়ে দিলেও কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে ওরা রাজি হবে না।

আলতা হাসল। ওরা মানে? ক'জনের সঙ্গে বিয়ে হবে তোর?

পারু একটু লজ্জা পেল। না মানে ছেলেপক্ষ আর কি! আসলে তোমার বিয়ে হয়ে যাবে তোমার বাবার টাকা পয়সার জোরে। বংশের জোরে। ওই যে লোকে বলে, 'জাতের মেয়ে কালোও ভাল, নদীর জল ঘোলাও ভাল'।

কেন যেন এখন আর পারুর কথা ভাল লাগছিল না আলতার। এতটুকু মেয়ে কী পাকা পাকা কথা বলে! তবে পারুকে এসব বুঝতে দিল আলতা। হঠাৎ করেই পারুর গালে হাত ছোঁয়াল, অনেকক্ষণ আগের কথা টেনে আনল, সব কিছুই ঠিক ছিল আমার। শুধু গায়ের রঙটাই খেয়েছে। আমার গায়ের রঙ যদি তোর মতো হত তাহলে আমার কোনও দুঃখ থাকত না।

আলতা আর দাঁড়াল না। মনজুদের বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। কামরাঙার ডালে তখন কী একটা পাখি এসে বসেছে! থেকে থেকে ডাকছিল সেই পাখি। হামানদিস্তা ঠুকে ঠুকে মবিন কবরেজ এখনও তাঁর কবরেজি অষুদ তৈরি করে যাচ্ছেন। হাওয়ায় আগের মতোই ভাসছে মিঠেল একখানা ভেষজ গন্ধ।

২

কী কর ফুফু?

চুলোয় ভাত বসিয়েছেন বকুল। তাঁর হাতের কাছে ছোট্ট একখানা মিষ্টি কুমড়ো আর বটি। মিষ্টি কুমড়ো মাত্র ফালি করতে যাবেন, রান্না ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল আলতা। তারপর ওই কথা' কুমড়োটা তখুনি আর ফালি করা হল না বকুলের। চোখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন। আলতাকে দেখে হাসলেন। তুই কখন এলি?

আলতা বলল্ এই তো এলাম।

আমি যে দেখলাম না?

কী করে দেখবে! তুমি তো ছিলে কুমড়ো নিয়ে, বটি নিয়ে! দুপুর হয়ে এল, রান্না করতে হবে না! বাড়ি ফিরেই তো ভাত দাও মা বলে চেঁচামেচি শুরু করবে মনজু।

আলতা ভুরু কুঁচকে বলল, বাজে কথা বল না।

বকুল খুবই অবকা হলেন। বাজে কথা মানে?

মনজু ভাই কখনও চেঁচামেচি করে না। তার মতো নিরীহ নরম মানুষ আমি জীবনে দেখিনি।

বকুল হাসলেন। নিরীহ নরম বলছিস ঠিকই আছে। কিন্তু মায়ের কাছে সব সময় অমন থাকে না। চিৎকার চেঁচামেচি কখনও কখনও করে।

কই আমি তো কখনও দেখলাম না।

তুই দেখবি কী করে! তুই কি সব সময় আমার বাড়িতে থাকিস! সব সময় না থাকি, বেশির ভাগ সময়ই থাকি। তাছাড়া মনজু ভাইও তো যখন তখন আমাদের বাড়িতে যাচ্ছে। দিনের বেশির ভাগ

সময়ই তো তাঁকে আমি দেখছি।

হয়ত তোর সামনে সে করে না। চুপচাপ থাকে, নিরীহ্ নরম হয়ে থাকে।

কেন, আমার সামনে নিরীহ নরম হয়ে থাকবে কেন?

তা আমি জানি না। মনে হয় তোকে মনজু খুব ভয় পায়।

এ কথায় খুবই অবাক হল আলতা। ভুরু কুঁচকে খানিক তাকিয়ে রইল বকুলের দিকে, তারপর রান্নাঘরের দরজার সামনে বসে পড়ল।

বকুল বললেন, মাটিতে বসলি কেন? বড় ঘর থেকে একটা পিঁড়ি নিয়ে আয়। পিঁড়িতে বস।

পিঁড়িতে বসতে হবে না। আমার মাটিই ভাল।

বকুল আর কথা বললেন না, মিষ্টি কুমড়ো ফালি করতে লাগলেন।

আলতা বলল, এটা তুমি কী বললে ফুফু?

কথাটা বুঝতে পারলেন না বকুল। বললেন, কোনটা কী বললাম? ওই যে বললে মনজু ভাই আমাকে খুব ভয় পায়।

সত্য কথাই বলেছি।

কী করে বললে! মনজু ভাই তোমাকে বলেছে?

না।

তাহলে?

আমি দেখেছি।

কেমন করে দেখলে, কোথায় দেখলে?

এই বাড়িতে।

হ্যাঁ।

কবে;

বেশ কিছুদিন হবে। সাত আট মাস আগে।

কী দেখলে?

মিষ্টি কুমড়োটি চার ফালি করেছেন বকুল। তিনটি ফালি সরিয়ে রেখে একটি ফালি ছোট ছোট করে কাটছেন এখন। কাটতে কাটতে বললেন, মনজু চাকরি বাকরি পাচ্ছে না, বি এ পাস করে বেকার বসে আছে.....।

বকুলের কথা মাঝখানেই থামিয়ে দিল আলতা। বেকার বসে আছে মানে! কোথায় বেকার বসে আছে মনজু ভাই! সকাল বিকেল অতগুলো টিউশনি করছে! গ্রামের পর গ্রাম পায়ে হেঁটে চষছে ছাত্র পড়াবার জন্য! রোদ বৃষ্টি নেই, ঝড় বাদল নেই, শীত খরালি নেই, একগ্রাম থেকে আরেক গ্রাম ছুটছে ছাত্র পড়াতে। তার টিউশনির টাকায় তোমাদের দুজন মানুষের সংসার চলছে তারপরও তুমি বলছ মনজু ভাই বেকার বসে আছে!

কুমড়ো কাটা রেখে কখন যে চোখ তুলে আলতার দিকে তাকিয়েছেন বকুল, কতক্ষন যে চোখে তাঁর পলক পড়েনি কে জানে? আলতার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখে পলক ফেললেন তিনি। গভীর গলায় বললেন, একটা কথা আমি আজ বেশ ভাল করে বুঝলাম।

আলতা চোখ পাকিয়ে বলল, আমার সঙ্গে চালাকি কর না ফুফু।

বকুল থতমত খেলেন। চালাকি মানে?

মানে হচ্ছে তুমি কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছ।

কোথায় কথা ঘোরাবার চেষ্টা করছি?

ওই যে বললে, একটা কথা আমি আজ বেশ ভাল করে বুঝলাম।

বাহ শুনলে বলব না! কী বুঝলাম সেটা আগে জানতে চাও। না চাইব না। তার আগে তুমি বল মনজু ভাই সম্বন্ধে আমি যা বলেছি তা ঠিক কী না? তাকে তুমি বেকার বলেছ সেটা অন্যায় বলেছ কী না!

অন্যায় ধরলে অন্যায়। কিন্তু আমি যে কারণে বলছি সেটা আসলে অন্যায় না। এইসব টিউসনি করে জীবন চলে বল! ছাত্র পড়াবার জন্য অত কষ্ট মানুষ করতে পারে! তারচে কোনও একটা স্কুলে মাস্টারি পেলে ভাল হত। হাইস্কুল না হোক প্রাইমারি স্কুলেও তো হতে পারে। আজকাল স্কুল মাস্টারদের কত ভাল অবস্থা।

প্রাইমারি স্কুলে চাকরির জন্য মনজু ভাই না একবার মুনসিগঞ্জ গিয়ে পরীক্ষা দিয়ে এল!

ওই পরীক্ষা পর্যন্তই। তারপর আর কোনও খবর নেই। আরে আজকাল শুধু পরীক্ষঅ দিয়ে বসে থাকলে চাকরি হয় নাকি! চাকরির জন্য তদবির করতে হয়, লোকজন ধরতে হয়।

কোন লোককে ধরবে? কে আছে তোমাদের?

চুলোয় ভাত উতড়োচ্ছে। এলুমিনিয়ামের হাড়ির মুখ মাটির সরায় ঢাকা। বলকে ওঠা ভাত শো শো শব্দে সরা ধাপাচ্ছে। আনমনা ভঙ্গিতে সরাটা নামিয়ে রাখলেন বকুল। নারকেলের মালায় তৈরি হাতায় একহাতা ভাত তুলে দু তিনটে ভাত আঙুলের ডগায় নিয়ে টিপে দেখলেন। এখনও পুরোপুরি ফোটেনি ভাত। হাড়ির মুখে আবার সরা চাপালেন বকুল। তারপর কুমড়ো কুটতে কুটতে বললেন, দেশগ্রামে কেউ হয়ত নেই কিন্তু ঢাকায় তো আছে।

আলতা সঙ্গে সঙ্গে বলল, কে আছে ঢাকায়?

মনজুদের আত্মীয় স্বজনরা আছে, আমার আত্মীয় স্বজনরা আছে। আমার এক চাচাত ভাই আছে আলতাফ। বেশ বড় চাকরি করে। ঢাকায় নিজের বাড়ি। তার কাছে গেলে সে চেষ্টা করে এই সব স্কুলের চাকরি মনজুকে পাইয়ে দিতে পারে। সব চাকরির চাবিকাঠি তো ওই ঢাকায়। তাছাড়া স্কুলের চাকরিই যে করতে হবে তারই বা কী মানে আছে। ঢাকায়ও তো চাকরি দিয়ে দিতে পারে আলতাফ! বি এ পাস ছেলের চাকরির অভাব নাকি!

এটাও ভুল কথা। বাংলাদেশে চাকরির সত্যি খুব অভাব। লোক থাকলে কোন কিছুরই অভাব নেই।

তা ঠিক। মনজু ভাই তাহলে ঢাকায় যায় না কেন?

বলে সে যাই করুক নিজের যোগ্যতায় করবে। কাউকে ধরাধরি করবে না।

ভালই তো বলে।

বকুল অবাক হলেন। মানে?

পুরুষমানুষদের তো এমনই হওয়া উচিত। যা করার নিজের যোগ্যতায় করবে। নিজের ক্ষমতায় করবে।

তুইও তো দেখি মনজুর মতোই কথা বলিস।

আলতা চুপ করে রইল।

বকুল বললেন, ওসব নিয়েই কথাবার্তা হচ্ছিল সেদিন।

রান্নাঘরের সঙ্গে বেশ বড় উঠোন। উঠোনের পশ্চিম পাশে বড় ঘর। ঘরের পেছনে বাঁশঝাড় আর দুতিনটে আমগাছ। একটি আমগাছ ঘরের চালায় উঠে প্রায় শুয়ে পড়েছে। সেই আমগাছের ওপর দিয়ে গলা মাড়িয়ে যেন উঠোনে উঁকি দিচ্ছে বাঁশঝাড়। চৈতালী হাওয়ায় বাঁশঝাড় এখন আকুলি বিকুলি করছে। বাঁশঝাড়ের মাথার ওপরকার আকাশ ভেঙ্গে যাচ্ছে স্বচ্ছ রোদে। আলতা আকাশের দিকে তাকিয়ে আনমনা গলায় বলল, কোনদিন?

যেদিন টের পেলাম মনজু তোকে খুব ভয় পায়।

আকাশের দিক থেকে চোখ ফেরাল আলতা। বকুলের মুখের দিকে তাকাল। ঘটনাটা আমাকে খুলে বল।

বকুল বললেন, সকাল বেলা সেদিন গুড়মুড়ি খেয়ে ছাত্র পড়াতে গিয়ে ছিল মনজু। পুরা বাজারের কাছে এক বাড়িতে পড়ায়, ওই বাড়িতে গেছে। ওখান থেকে ফিরে যাবে নযাঙ্কর। আমাকে বলে গেছে নযাঙ্কর যাওয়ার আগে বাড়ি হয়ে যাবে। সকাল নটা দশটার দিকে একবার ভঅত খাই আমরা। মনজু বলেছে ভাত খেয়ে তারপর নযাঙ্কর যাবে। আমি ভাত রেঁধে বসে রইলাম কিন্তু মনজু এল না। এল দুপুরের দিকে। এসেই চিৎকার চেঁচামেচি। তাড়াতাড়ি ভাত দাও মা। খিদেয় মরে গেলাম। আমি বললাম, গিয়েছিলি কোথায়? আমি যে সকাল বেলা ভাত রেঁধে বসে রইলাম, খেয়ে গেলি না কেন? বলল পুরার ছাত্রটা পড়াতে পড়াতে দেরি হয়ে গেল, এজন্য আর বাড়ি আসিনি। ওদিক দিয়েই নযাঙ্করে চলে গেলাম। শুনে আমার খুব রাগ হল। কী এমন কাজ নযাঙ্করে যে না খেয়ে যেতে হবে। বলল নতুন একটা টিউশনির চেষ্টা করছি। ক্লাশ নাইনের ছাত্রী বেতন ভাল দেবে। আমি রেগে বললাম, সারাজীবন তোকে এই টিউশনি করেই কাটাতে হবে। চাকরি বাকরি কখনও হবে না তোর। শুনে মনজুও রেগে গেল। তর্ক জুড়ে দিল আমার সঙ্গে। আমি ততক্ষণে ওর জন্য ভাত বেড়েছি। মনজু ভাতের থালা ঠেলে সরিয়ে দিল। ভাত খাব না। আমার আর খিদে নেই। তারপর মুখ গোমড়া করে বসে রইল। মনটা ততক্ষণে নরম হয়েছে আমার। বুঝেছি না খেলে এতটা পথ রোদে হেঁটে এসেছে, মেজাজটা তিরিক্ষি হয়ে আছে মনজুর। খুব সাধাসাধি করলাম কিন্তু কিছুতেই ভাত মুখে দেয় না সে। এই সময় তুই এলি। আমরা ছিলাম বড় ঘরে কিন্তু তুই এসে দাঁড়িয়েছিলি রান্নাঘরের সামনে। আমাকে ডাকছিলি। তোর গলা শুনে আমি কিছু না ভেবেই মনজুকে বলালাম, তাড়াতাড়ি খেতে বস নয়ত আলতাকে ডাকছি আমি। এখুনি বলছি যে তুই ভাত খাচ্ছিস না। আমার সঙ্গে ঝগড়া করছিস। কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভাতের থালা টেনে নিল মনজু। খেতে শুরু করল। খেতে খেতে বলল, আলতাকে কিন্তু এসব কথা বল না। তাতেই আমি বুঝেছিলাম মনজু তোকে ভয় পায়। এসব কথা শুনতে শুনতে ভেতরে ভেতরে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গেল আলতা। উত্তেজিত হয়ে গেল। এসব কথা আমাকে তুমি বলনি কেন?

বকুল একটু অবাক হলেন। এ আর বলার মতো কী হল? তাহলে আজ বললে কেন?

কথা উঠল বলে বললাম।

ভাতের হাড়ির সরা আবার সরালেন বকুল। আগের মতো করে ভাত দেখলেন। ভাত একদমই ফুটে গেছে। এখুনি মাড় না গাললে ...হয়ে যাবে।

হাড়ি নামিয়ে ভাত ঠিকনা দিলেন বকুল।

আলতা কেমন আনমনা হয়ে আছে।

ভাত ঠিকনা দিয়ে আলতার দিকে তাকালেন বকুল। যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বললেন, যাহ আমি তো ভুলেই গেছি। তুই এখনও এখানে বসে আছিস কেন?

আলতা অবাক হল। তাহলে কী করব?

বাড়ি যা।

কেন?

আরে তোকে আজ দেখতে আসবে না?

তাতে কী হয়েছে?

যে মেয়েকে পাত্রপক্ষ দেখতে আসবে সেই মেয়ের সেদিন বাড়ি থেকে বেরুতে হয় না।

কেন, বেরুতে হয় না।

কেন, বেরুলে কী হয়?

কী হয় মানে? পাড়া বেড়ালে, শরীরে রোদ লাগলে চেহারায় একটা ক্লান্তির ভাব থাকে। দেখতে খারাপ লাগে। তোর আজ বাড়ি থেকে বেরুনোই উচিত হয়নি।

আলতা চুপ করে রইল।

কথা বলার ফাঁকে কুমড়ো কোটা শেষ করেছেন বকুল। সেই কুমড়ো একটা হাড়িতে গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, শরীরে আজ হলুদ মাখিসনি কেন?

আলতা বলল, হলুদ মাখব কেন?

জানিস না কেন মাখবি?

না।

বাজে কথা বলিস না।

আমি বাজে কথা বলছি না। কেন হলুদ মাখব?

পাত্রপক্ষ যেদিন মেয়ে দেখতে আসে, মেয়েরা সেদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই সারা শরীরে কাঁটা হলুদ বেটে মেখে নেয়। হলুদ বাটা শরীরে মেখে দুপুর পর্যন্ত বসে থাকে। তারপর গোসল করে, খাওয়া দাওয়া করে এক দুঘন্টা ঘুমোয়। গ্রামদেশে মেয়ে দেখা হয় বিকেল বেলা, ঠিক বিকেল বেলা নয়, শেষ বিকেলে যখন রোদের রঙ অন্য রকম হয়। ওই রোদাটাকে বলে কনে দেখা রোদ কিংবা কনে দেখা আলো। যে সব মেয়ে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত গায়ে হলুদ মেখে বসে থাকে, গোসল করে, সাবান দিয়ে ঘসে শরীর থেকে হলুদ তারা ঠিকই ধুয়ে ফেলে কিন্তু হলুদের আভাটা তো ধুতে পারে না। আভাটা শরীরে মুখে থেকেই যায়। এক দু'ঘন্টা ঘুমোলে সেই আভাটা পাকা হয়ে বসে মুখে। কণে দেখা আলোয় সেই মুখের দিকে যখন তাকায় লোকে, তাকিয়ে আর চোখ ফেরাতে পারে না। মুগ্ধ হয়ে যায়।

আলতা তাচ্ছিল্যের গলায় বলল, এসব আমি জানি।

বকুল অবাক হলেন। তাহলে যে বললি হলুদ কেন মাখতে হয় তুই জানিস না।

আলতা উঠে দাঁড়াল। এমনি বলছি।

তুই খুব অদ্ভুত মেয়ে।

হয়েছে, এবার তুমি সেই কথাটা বল।

কোন কথাটা?

মনজু ভাইকে বেকার বলাতে আমি যখন তোমাকে অতকথা বললাম শুনে তুমি বললে, একটা কথা আমি আজ বেশ ভাল করে বুঝলাম, কী বুঝলে তুমি, বল?

বকুল হাসলেন। কথাটা তুই ভুলিসনি?

না। কেন ভুলব।

আমি আসলে বুঝেছি মনজুর জন্য তোর খুব টান। এটাই বলতে চাইছিলাম তখন।

আলতা আবার আনমনা হল। আনমনা হয়ে মনজুর ঘরের দিকে তাকিয়ে রইল।

মনজুর ঘরটা উঠোনের পুবদিকে। ছোট্ট সুন্দর চৌচালা পাটাতন ঘর। ঘরের দক্ষিণ দিকটা বাগান মতো। তিন চারটে পেয়ারা গাছ আছে, বিশাল একটা বাতাবি লেবুর ঝোঁপ, হাসনুহেনা বেলিফুলের যাড় আর একটা নিমগাছ। দুটো ঘর শালিখ টুক টুক করে লাফাচ্ছে বাগানের সাদা মাটিতে। চৈত্রদিনের উদাস হাওয়া মগ্ন হয়ে বইছে গাছ পালার বনে। এই হাওয়ায় মনের ভেতরটা কেমন উথাল পাথাল করে আলতার।

আলতা অমন আনমনা হয়ে আছে দেখে বকুল এক সময় বললেন, যা বাড়ি যা মা, গিয়ে গোসল টোসল করে একটু ঘুমো। বিকেলেবেলা তোকে দেখতে আসবে।

আলতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যাচ্ছি। যাওয়ার আগে তোমাকে একটা কথা বলে যাই ফুফু। পাত্রপক্ষ মেয়ে দেখতে এলে মেয়েরা সকাল থেকে কী কী করে সব আমি জানি। জেনেও কিছুই করিনি। ইচ্ছে করেই করিনি। কেন করিনি সে কথা তোমাকে কখনও বলা যাবে না।

আলতার কথা শুনে ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন বকুল।

৩

স্বর্ণগ্রাম হাইস্কুলের শিমুল গাছটি যেমন পুরনো তেমন বিখ্যাত। স্কুল বাড়ির মাথা ছাড়িয়ে অনেকখানি ওপরে উঠে আছে। কতকাল ধরে এই একই অবস্থায় আছে কে জানে। বহুদূরের খোলামাঠ থেকে পরিষ্কার দেখা যায় গাছটি। আকাশের দিকে মাথা তুলে চারপাশে ডালপালা ছড়িয়ে ছবির মতো দাঁড়িয়ে আছে। এই শিমুল গাছ দেখে বিক্রমপুরের দশ গ্রামের লোক সনাক্ত করে, এই গ্রামের নাম স্বর্ণগ্রাম। স্কুল বাড়ির চারপাশের যে কোনও রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় গ্রাম গেরস্তের চোখ গাছটির দিকে একবার যাবেই। অচেনা পথিকরাও খেয়াল করে দেখে গাছটি। গাছের বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করে।

আজ দুপুরে বাড়ি ফেরার সময় এই শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে মনের ভেতর বহুকালের পুরনো এক বাংলা গান গুনগুনিয়ে উঠল মনজুর–

"ও শিমুল বন
দাও রাঙিয়ে মন
কৃষ্ণচূড়া দোপাটি আর পলাশ
দিল ডাক।'

একটি মাত্র শিমুল গাছ দেখে শিমুল বনের গান কেন মনে এল মনজুর কে জানে! ছাত্র পড়িয়ে বাড়ি ফিরছিল সে। পায়ে বাটা কোম্পানির খয়েরি রঙের পুরনো স্যান্ডেল সু। চৈত্র দিনের মেঠোপথ সাদা ধুলোয় ধূসর হয়েছিল। বেশ খানিক পথ হেঁটে আসছে বলে মনজুর স্যান্ডেল সুয়ের রঙ চেনা যাচ্ছিল না। এমনিতেই রঙচটা পুরনো স্যান্ডেল তার ওপর শাদা ধুলোর আস্তরণ। মেঠোপথ এবং পায়ের স্যান্ডেল একই রকম দেখাচ্ছিল।

মনজুর পরনে শাদা পাজামা আর আকাশি রঙের মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবি, বুক, পিঠ এবং বগলের কাছটা ঘামে ভিজে এমন একটা অবস্থা হয়েছে, পাঞ্জাবিটা মোটা বলে, খদ্দরের বলে এখন বেশ আরামই লাগছে মনজুর। ঘামে ভিজে পাঞ্জাবির ভেতরটা বেশ শীতল হয়েছে।

মাথার উপর ছাতা আছে মনজুর। তবে পায়ের স্যান্ডেলের মতো ছাতাটা তত পুরনো নয়। এখন পর্যন্ত একটাও তালি পড়েনি। ছাতাটা যে খুবই যত্নে ব্যবহার করে তা বোঝা যায়।

মুখখানি মনজুর ঘামে ভিজে তেলতেলে হয়ে আছে। মাথার ঘন চুল গোড়ায় গোড়ায় ভিজে উঠেছে। দু'কানের পাশ বেয়ে ঘাড়ের দিকে নামছে ঘাম। এরকম অবস্থায় কী করে যে গান আসে মানুষের মনে!

মনজু অবশ্য গান পাগল মানুষ। তবে সব ধরনের গান সে পছন্দ করে না। দেশ গ্রামের ছেলে হয়েও যাত্রা পালাগান, শরিয়তি মারফতি কিংবা পল্লীগীতি ভাঁটিয়ালি ভাওয়াইয়া– এই ধরনের গান একদমই শোনে না সে, একদমই পছন্দ করে না। সে শোনে আধুনিক গান, পছন্দ করে পুরনো দিনের আধুনিক বাংলা গান। হেমন্ত, শ্যামল মিত্র, মান্না দে, সতীনাথ, মানবেন্দ্র, সন্ধ্যা, লতা– এইসব শিল্পীর গান তার ভাল লাগে। জীবনে একটিই শখ তার এইসব শিল্পীর গান শোনা। শুনে শুনে গানগুলো নিজের গলায় তোলা। একাকী নিভৃতে নিজের মতো করে গাওয়া।

এখন তেমন এক নিভৃত সময় মনজুর। যে রাস্তা দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে সে, সেই রাস্তায় লোকজনের চিহ্নমাত্র নেই। দূর শস্যের মাঠে দু'একজন কৃষক ক্লান্ত ভঙ্গিতে কাজ করছে, দু একটি গরু চরছে। রাস্তার দু'পাশে মানুষের ঘরবাড়ি, খাল কিংবা পুকুর। গাছের ছায়ায়, ঝোঁপ-ঝাড়ের আড়ালে স্তব্ধ হয়ে আছে চৈত্রের দুপুর। দু'একটা পাখি ক্লান্ত সুরে ডেকে এই স্তব্ধতা ভাঙার চেষ্টা করছে। দুপুর বেলার উদাস হাওয়া বয়ে যাচ্ছে মাঠ থেকে মাঠে। এসবের কিছুই খেয়াল করল না মনজু। শিমুল গাছটির দিকে তাকিয়ে হাঁটতে হাঁটতে প্রথমে গুনগুন করে গানটি গাইল সে। তারপর এক সময় গলা ছেড়ে দিল। চৈত্র মাসের নির্জন দুপুর মনজুর গানে মুখর হয়ে উঠল–

'মধুর লোভে ভিড় জমাল
মৌ পিয়াসী অলির ঝাঁক।'

এই একটি গান ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে গাইতে কখন যে তালুকদার বাড়ির সামনে চলে এল মনজু, মনজু তা খেয়াল করল না।

কিন্তু মনজুকে খেয়াল করলেন রোকেয়া। বেশ অনেকক্ষণ হল পুকুরঘাটে এসেছেন তিনি। গোসল করে, গোসলের আগে পরে থাকা জামা কাপড় সাবান দিয়ে কেঁচেছেন। সেই জামা কাপড় হাতে পুকুরঘাট থেকে উঠে আসছিলেন। প্রথমে দূর থেকে মনজুর গলা শুনলেন তিনি। শুনে থমকে দাঁড়ালেন। তারপর ছাতা মাথায় মনজুকে এগিয়ে আসতে দেখলেন। তখনও মগ্ন হয়ে গান গাইছে মনজু।

তালুকদার বাড়ির পুকুর ঘাটটা রাস্তার পাশে। বাঁধান ঘাটলার বিশাল পুকুর। পুকুর ভর্তি রক্ত শাপলা। আর পকুরের তিন পাড়ে নারকেল, কলা, পেয়ারা, নিম, কদম এমন কি হিজল গাছও আছে। ছায়াময় শান্ত একটা পরিবেশ। তিন পাড়ের গাছপালা দিনমান পুকুর জলে ছায়া ফেলে রাখে বলে এই পুকুরের জল চোত বোশেখ মাসের তীব্র খরায়ও গরম হয় না। বছরভর শীতল।

পুকুর ঘাটের সঙ্গে যে রাস্তা, রাস্তার ওপাশে বেশ অনেকখানি খোলা জায়গা। ফুল ফলের ছোট বড় নানা রকম গাছপালায় ভর্তি। তারপর পুরনো আমলের জমিদার বাড়ির বিশাল বিল্ডিং। বাড়ির পেছন দিকে পাঁচ দশ বিঘার ওপর আম বাগান। বাগানের পূবে পশ্চিমে দু'খানা পুকুর। পূবের পুকুরটি কচুরিপানায় ভর্তি। পশ্চিমেরটা বাড়ির মহিলাদের ব্যবহারের। তাদের গোসল, কাপড় ধোয়া, থালা বাসন মাজা সবই চলে ওই পুকুরে। বাড়ির বাইরের এই পুকুরটি বাড়ির পুরুষমানুষদের।

তাহলে রোকেয়া আজ এই পুকুরে এসেছেন কেন?

উদাস আনমনা ভঙ্গিতে গান গাইতে গাইতে পুকুর ঘাটের কাছাকাছি চলে এসেছে মনজু। ঘাটলার মুখে রোকেয়াকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থতমত খেল। নিজের অজান্তেই গান থেমে গেল তার।

রোকেয়া হাসি মুখে বললেন, তোকে দেখেই দাঁড়িয়েছি আমি।

মনজু লাজুক গলায় বলল, তাই নাকি! কখন?

অনেকক্ষণ। দূর থেকে তোকে আসতে দেখেই।

কিন্তু আমি আপনাকে দেখিনি।

কী করে দেখবি! তুই তো ছিলি গান নিয়ে। গান গাওয়ার সময় অন্য কোনওদিকে খেয়াল থাকে তোর!

মনজু এবার সত্যি সত্যি লজ্জা পেল। খানিক মাথা নিচু করে রাখল, তারপর চটপটে গলায় বলল, আপনি এই পুকুরে কী করছেন মামী?

রোকেয়া সঙ্গে সঙ্গে বললেন, গোসল করতে আসছিলাম।

এই পুকুরে?

হ্যাঁ।

কেন? ভেতরের পুকুরে কী হয়েছে?

জায়গা পাচ্ছিলাম না। বাড়িতে অনেক লোকজন। আলতার খালা ফুফুরা আসছে, তাদের ছেলেমেয়েরা আসছে।

হঠাৎ এত লোক?

ওমা তুই জানিস না!

মনজু খুবই অবাক হল। না তো! কী হয়েছে?

আলতাকে আজ দেখতে আসবে।

মনজু নির্মল মুখ করে হাসল। তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কোত্থেকে?

ছেলেদের বাড়ি পয়সা।

লৌহজংয়ের ওদিককার পয়সা?

হ্যাঁ।

ছেলে কী করে?

বি এ পাশ। কাপড়ের ব্যবসা করে। ঢাকার ইসলামপুরে দোকান আছে। অবস্থা খুব ভাল। বংশও ভাল।

ঢাকায় নিজের বাড়ি আছে?

না, এখনও বাড়ি করেনি। তবে বাসা আছে ঢাকায়।

তার মানে এখানে বিয়ে হলে ঢাকায় গিয়ে থাকবে আলতা!

না তা থাকবে না।

মনজু খুবই অবাক হল। কেন?

ছেলেটি বাড়ির ছোট ছেলে। চার বোন তিন ভাই ছেলের। বোনদের সবারই বিয়ে হয়ে গেছে। যে যার শ্বশুর বাড়ি থাকে। বড় দুইভাইও বিয়ে করেছে। গ্রামের বাড়িতেই থাকে তারা। লৌহজং বাজারে ধানচালের আড়ত আছে মেজভাইয়ের। বড় ভাই করে গেরস্থালি। অনেক ধানের জমি তার। কিন্তু বড় দুই ছেলে আর ছেলের বউ বাচ্চারা ছেলের মার দিকে তাকায় না। মা অসুস্থ মানুষ। বছরভর বিছানায় পড়ে আছে।

এসব কথা শুনে মনজু কেমন বিরক্ত হল। ওই বাড়ির বউ হয়ে আলতা তাহলে অসুস্থ শাশুড়ির সেবা যত্ন করবে!

রোকেয়া মৃদু হাসলেন। ছেলে নাকি এখন বিয়ে করবে এই কারণেই। বিয়ে করে বউ রাখবে মায়ের কাছে।

আর নিজে থাকবে ঢাকায়, তাই না?

হ্যাঁ।

শুনে খুশি হলাম না মামী।

কেন?

বিয়ের পর মেয়েদের জীবনে কত সাধ আহলাদ থাকে। সেসবের কিছুই হবে না, শুধু অসুস্থ শাশুড়ির সেবা করা। আলতার এসব ভাল লাগবে?

ভাল না লাগলেও তো অনেক কাজ মানুষকে করতে হয় বাবা।

ওদের টাকা পয়সা আছে কাজের লোকজন রেখে দিক মাকে। একজনের জায়গায় দু'জন রেখে দিক।

বাড়ির বউ যা করবে কাজের লোকরা কি তা করবে! আল্লাহ্ না করুন তোর মা যদি অমন অসুস্থ হন, বছরভর পড়ে থাকেন বিছানায়, তুই চাইবি না তোর বউ তার সেবা করুক?

এ কথা শুনে মনজু কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল। আনমনা চোখে রোকেয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। কথা বলতে পারল না। রোকেয়া হাসলেন। এখন কথা বলছিস না কেন?

একহাতে ছাতা ধরা, অন্য হাতে মাথা চুলকাল মনজু। এ কথার কোন জবাব আমি দিতে পারছি না মামী।

জবাব দেয়ার দরকারও নেই। শোন্, মেয়ের কপালে বিয়ে যেখানে আছে সেখানেই হবে। বিয়ের পরের সুখ দুঃখের ব্যাপারটিও কপালেরই ব্যাপার। কেউ জানে না সুখ হবে না দুঃখ হবে। তবু মা বাবা এমন ছেলে দেখেন, ছেলের বংশ এবং টাকা পয়সা দেখেন যা দেখে বোঝা যায় হয়ত এখানে বিয়ে হলে তাদের মেয়েটা সুখে থাকবে। এই ছেলের কথা শুনে তাই মনে হয়েছে আমাদের। তোর মামা খুব পছন্দ করেছেন। তার খুব আগ্রহ আলতার বিয়ে এখানেই হোক।

এই ছেলে আনল কে?

মেছের ঘটক।

কখন আসবে তারা দেখতে?

এই তো ঘন্টাখানেকের মধ্যে।

মনজু অবাক হল। এরকম ভর দুপুরে কেউ মেয়ে দেখে নাকি?

রোকেয়া হাসলেন। এখন দেখবে না।

তাহলে?

দেখবে বিকেলে। এখন আমাদের বাড়িতে এসে বাংলাঘরে বসবে, খাওয়া দাওয়া করবে। তারপর বিকেল বেলা মেয়ে দেখে চলে যাবে।

ছেলে নিজেও আসবে, মামী?

না। ছেলের ভাইরা আসবে, বোন জামাইরা আসবে। মুরব্বি ধরনের দু'একজন আত্মীয় আসবে।

মোট কতজন লোক?

দশ পনের জন হবে।

এরা দেখে যাওয়ার পর, মেয়ে পছন্দ হওয়ার পর তো তাহলে আরও একবার দেখার ব্যাপার থেকে গেল।

কেন? আবার দেখা কিসের?

ছেলে নিজে একবার দেখতে আসবে না?

না, তা আসবে না।

বলেন কী! আজকালকার ছেলে, তাও ঢাকায় থাকা ছেলে নিজে মেয়ে না দেখে ভাই আর বোন জামাইদের পছন্দে বিয়ে করে ফেলবে?

ছেলের কাছে আলতার ছবি পাঠান হয়েছিল। ছবি দেখে আলতাকে পছন্দ করেছে।

তাহলে আবার এত লোকজন আজ দেখতে আসছে কেন?

ছবি আর বাস্তব আলাদা ব্যাপার না! কোনও কোনও মানুষকে ছবিতে খুব ভাল দেখায়, বাস্তবে দেখায় না। তাছাড়া মেয়ের কথা বলা, হাঁটাচলা এসব দেখতে হবে না! পড়াশুনা আসলেই সে জানে কী না, তার কোথায় কোনও খুঁত আছে কী না বুঝতে হবে না!

মনজু কথা বলল না। চুপ করে রইল।

রোকেয়া বললেন, ছেলে নিজেই এজন্য তার গার্জিয়ানদের পাঠাচ্ছে। গার্জিয়ানরা যদি মনে করে, না সব ঠিকই আছে তাহলে বিয়ের দিন তারিখ করে ফেলবে।

আজই?

হয়ত আজই করবে না। দু একদিন পর আমাদেরকে জানাবে। যাক, আলতার বিয়ে হয়ে গেলে ভালই হয়। আপনাদের একটা দায়িত্ব শেষ হয়।

দোয়া করিস বাবা।

মনজু হাসল। আলতা খুব ভাল মেয়ে। ও কোথাও আটকাবে না। ওর কপাল ভালই হবে।

কিন্তু আমার একটু ভয় হচ্ছে বাবা।

কেন?

মেয়েটা তো কালো।

তাতে কী হয়েছে?

রঙ দেখে যদি আলতাকে ওরা পছন্দ না করে! ছবিতে তো আর গায়ের রঙ বোঝা যায়নি।

রোকেয়াকে সান্ত্বনা দেয়ার গলায় মনজু বলল, এসব বাজে চিন্তা করে মন খারাপ করবেন না তো মামী। আলতার গায়ের রঙ কালো হয়েছে তো কী হয়েছে! ওর চেহারা যে খুব সুন্দর এটা লোকে দেখবে না! সব লোক কি অন্ধ নাকি! গায়ের রঙ দিয়ে কী হয়! চেহারাটাই আসল কথা।

তারপর একটু থেমে মনজু বলল, যান, বাড়ি যান মামী। লোকজন আসার সময় হয়ে গেল।

রোকেয়া হঠাৎ করে ব্যস্ত হলেন। হ্যাঁ যাচ্ছি। কিন্তু তোকে যা বলতে চেয়েছি সেই কথাটাই এখনও বলা হয়নি।

কী কথা মামী?

তুই আজ দুপুরে আমাদের বাড়িতে খাবি।

কেন?

কেন আবার, এমনি। তুই তো আমার বাড়ির ছেলের মতোই। গ্রাম সম্পর্কের হই আর যাই হই আমি তোর মামী। মামাতো বোনকে দেখতে আসবে তুই সেখানে থাকবি না?

দেখবে তো বিকেল বেলা। তখন আসব।

এখন অসুবিধা কী?

না কোনও অসুবিধা নেই।

নাকি আগে বলিনি বলে কিছু মনে করেছিস! এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে খাওয়ার কথা বলছি এসব নিয়ে ভাবছিস না তো?

আরে না। আপনাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক অমন নাকি! আমি তো যখন তখন আপনাদের বাড়ি যাচ্ছি, খাচ্ছি।

তাহলে বাড়ি গিয়ে গোসল টোসল করে আয়। ওদের খাওয়া দাওয়ার একটু তদারকিও তো করতে হবে।

রোকেয়া আর দাঁড়ালেন না।

বাড়ি ঢুকে ছটফটে গলায় মনজু বলল, মা, আমার ওই গরদের পাঞ্জাবিটা বের কর তো! আর ইস্তিরি করা পাজামাটা।

বকুল খুবই অবাক হলেন।

রান্নাবান্না শেষ করে গোসলও সেরে ফেলেছেন তিনি। বড় ঘরের দাওয়ায় বসে ছেলের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ছেলে ফিরলে খেতে যাবেন।

কিন্তু মনজু বাড়ি ফিরে বলল ওই কথা।

বকুল বললেন, এখন পাজামা পাঞ্জাবি দিয়ে কী হবে?

কী হবে আবার! পরব।

কেন?

আমার এক জায়গায় দাওয়াত আছে।

কোথায়?

আলতাদের বাড়ি।

কথা বলতে বলতে ছাতাটা বন্ধ করল মনজু। পাঞ্জাবি খুলে উঠোনের তারে মেলে দিল। চটপটে হাতে দাড়ি কামানোর জিনিসপত্র বের করল। রান্নাঘর থেকে জলচৌকিটা এনে সেই জলচৌকির ওপর মুখ দেখার ছোট্ট আয়নাটা রেখে গালে সাবান ঘষতে লাগল।

অবাক হয়ে ছেলের কান্ডকারখানা দেখছিলেন বকুল। খানিক দেখে বললেন, হঠাৎ আলতাদের বাড়ি দাওয়াত কেন তোর?

দ্রুত হাতে দাড়ি কামাতে লাগল মনজু। আলতাকে আজ দেখতে আসবে।

তা আমি জানি।

কে বলল তোমাকে?

আমি আগে থেকেই জানতাম। তারপর আলতাও বলল।

আলতা আজ এসেছিল নাকি?

হ্যাঁ। কিন্তু সে তো তোর দাওয়াতের কথা কিছু বলল না?

আলতা জানে না। এখন বাড়ি ফেরার সময় ঘাটলার ওখানে মামীর সঙ্গে দেখা, তিনি বললেন।

একদিককার গাল কামিয়ে অন্যদিককার গালে মাত্র রেজার লাগাতে যাবে মনজু, হঠাৎ করে বলল, আলতাকে আজ দেখতে আসবে একথা তুমি জানতে কিন্তু আমাকে বলনি কেন?

আমি ভেবেছি তুই জানিস। আচ্ছা কোথাকার ছেলে দেখতে আসছে আলতাকে, কী বিত্তান্ত তোর মামী তোকে কিছু বললেন?

হ্যাঁ বলেছেন।

রোকেয়ার মুখে শোনা সব কথা মাকে খুলে বলল মনজু।

শুনে বকুল বললেন, তাহলে তো খুবই ভাল জায়গা থেকে প্রস্তাব এসেছে আলতার।

তা এসেছে। তবে এখানে বিয়ে হলে অসুস্থ শাশুড়িকে টানতে হবে আলতার। এই একটা ব্যাপার আমার পছন্দ হয়নি মা।

কেন? এটাই তো বেশি পছন্দ হওয়ার কথা তোর?

দাড়ি কামানো শেষ হয়েছে, মুখের এখানে ওখানে এখনও সাবানের ফেনা লেগে আছে, এই অবস্থায় মায়ের দিকে চোখ তুলে তাকাল মনজু। তোমার কথাটা আমি বুঝতে পারলাম না মা।

বকুল হাসলেন। আমি যদি এখন অসুস্থ হই, বিছানা ছেড়ে উঠতে না পারি, তুই চাইবি না বিয়ে করে বউ এনে সেই বউকে দিয়ে আমার সেবা করাতে?

মনজু সরল মুখ করে হাসল। তা তো চাইবই।

ওই ছেলেটিও চাইছে। আমি তো মনে করি ছেলেটি ভাল ছেলে।

এখন তোমার কথায় আমারও তাই মনে হচ্ছে।

বকুল কেমন একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। যাক্ আলতার বিয়েটা হয়ে গেলে হয়। তবে মেয়েটার আজ মনটা খুব খারাপ দেখলাম বুঝলি।

কী রকম?
মুখ দেখে কথা শুনে মনে হল ওর বুকের ভেতর বোধহয় অন্য রকমের একটা কষ্ট হয়েছে।
কী কষ্ট হবে?
সেটাই তো বুঝতে পারলাম না।
মামীর মতো আলতাও হয়ত ভাবছে ওর গায়ের রঙ কালো, কালো মেয়েকে ছেলের গার্জিয়ানরা পছন্দ করবে কী না। কালো হলেও আলতার চেহারা খুব সুন্দর না মা? হাজারে ওর মতো মেয়ে একটা হয় না।
বকুল চুপ করে রইলেন।
মনজু বলল, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে মা?
কার জন্য কষ্ট হবে? আলতার জন্য? তা তো একটু হবেই। ঘুরে ফিরে সারাক্ষণ মেয়েটি আমার কাছে আসে। বিয়ে হয়ে গেলে এভাবে আর আসবে না। দিনের পর দিন ওর মুখটা আর দেখা হবে না আমার।
আমি কিন্তু আলতার কথা তোমাকে বলিনি।
তাহলে কার কথা বললি?
আমার কথা।
তোর আবার কী কথা?
তুমি যে আমার জন্য এত কষ্ট করে রান্না করে রাখলে, আমি তো তোমার রান্না আজ খেতে পারছি না। এজন্য তোমার কষ্ট হচ্ছে না?
না।
কেন?
আমার বরং ভাল লাগছে। আমার হাতে রান্না এই সাধারণ খাবার তো তুই রোজই খাচ্ছিস। আজ আলতাদের বাড়িতে একটু ভাল খাবার খেলি। তুই কোথাও ভাল কিছু খাচ্ছিস জানলে আমার যে কী ভাল লাগে সে তোকে আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না।
দাড়ি কামাবার জিনিসপত্র গুছিয়ে রেখে বকুলের সামনে এসে দাঁড়াল মনজু। শিশুর মতো দু'হাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল। কিন্তু তোমাকে ছেড়ে যে কোনও ভাল খাবারই খেতে আমার ইচ্ছে করে না। আমাদের সংসারে তুমি যা রান্না কর, তুমি আর আমি বসে যখন ওই খাবার খাই, মাগো, ওর চে' ভাল খাবার, ওর চে' মূল্যবান কোনও খাবার এই পৃথিবীতে নেই।
ছেলের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে বুকের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে দিলেন বকুল। হয়েছে। তুই এখন তাড়াতাড়ি গোসল করে আয়। আলতাদের বাড়িতে লোকজন এতক্ষণে নিশ্চয় এসে পড়েছে।
মনজু আর দাঁড়াল না। পুকুর ঘাটের দিকে চলে গেল।

শাদা পাজামা আর গরদের পাঞ্জাবি পরে মনজু যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে, নিজের ছেলেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন বকুল। সত্যি তার ছেলেটি খুব সুন্দর।

৪

ঘটকদের চরিত্র যেমন হওয়া উচিত, মেছের ঘটকের চরিত্র ঠিক তেমন। এই পেশার লোকদের চরিত্রে দোষ গুণ যা, যা থাকার সবই তার আছে। প্রচুর খেতে পারে সে, প্রচুর কথা বলতে পারে। মিথ্যে বলে সত্যের চেয়েও নিখুঁত করে। যে কোনও পরিবেশে বিয়ের উপযুক্ত ছেলে মেয়ে

দেখলে, হারানো গরু ফিরে পেলে গৃহস্তের চোখ যেমন চকচক করে ওঠে, মেছের ঘটকের চোখ ঠিক তেমন চকচক করে। মেয়ে দেখলে সেই মেয়ের সঙ্গে তো আর তার বিয়ে নিয়ে সরাসরি কথা বলতে পারে না, খোঁজ খবর নিয়ে মেয়ের মা বাবার সঙ্গে কথা বলে। মেয়েটি মাশাল্লাহ আপনার খুব সুন্দর, খুব লক্ষ্মী। এই মেয়ে যে ঘরে যাবে, সেই ঘর চাঁদের আলোয় ভরে যাবে। মেয়ের জন্য কী ধরনের জামাই চান! অনেক ভাল ভাল ছেলে আছে হাতে। বলেন তো ছেলে দেখাই।

তারপর ছেলে দেখতে লেগে যায় মেছের ঘটক।

আর যদি বিয়ের উপযুক্ত ছেলে পায় হাতের কাছে, কখনও কখনও সরাসরি ছেলের সঙ্গেই তার বিয়ে নিয়ে কথা বলতে শুরু করে। আপনি তো মাশাল্লাহ খুবই ভাল ছেলে বাবাজি। বিয়ে শাদী করে ফেলেন। খুবই ভাল ভাল মেয়ে আছে আমার কাছে। এখন চাইলে এখনই ছবি দেখাতে পারি। যাকে পছন্দ হয় বলেন, বিয়ে করিয়ে দিই। আর আপনি বলতে লজ্জা পেলে আপনার মা বাবার সঙ্গে কথা বলি।

তালুকদার বাড়ি এসে খেতে বসে মনজুকে দেখতে পেয়েছিল মেছের ঘটক। দেখে যথারীতি চোখ দুটো চকচক করে উঠেছে। একদিকে এত ভাল ভাল খাবার আরেকদিকে অমন একখানা ছেলে, কোনটা ফেলে কোনটা নিয়ে ব্যস্ত হবে সে খানিক বুঝতে পারল না। তারপর ঠিক করল এক সঙ্গে দুটো কাজই চালাবে। খেতে খেতেই ছেলেটির সঙ্গে কথা বলবে, খোঁজ খবর নেবে।

মনজুকে হাত ইশারায় ডাকল মেছের ঘটক। এই যে বাবাজি, শোনেন।

পাত্রের ভাই, বোন জামাই এবং অন্যান্যদের খাবার দাবারের তদারক করছিল মনজু। মেছের ঘটকের ডাকে তার কাছে ছুটে এল। আমাকে ডাকছেন?

জ্বী। আপনাকে ছাড়া আর কাকে ডাকব বলুন! আপনার মতো আর কে আছে এখানে!

মেছের ঘটকের কথা বুঝতে পারল না মনজু। হাসি হাসি মুখ করে বলল, আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

বসেন এখানে। আরও কথা বলি তারপর বুঝবেন সব।

কিন্তু আমি যে ওদিকে, মানে ছেলের ভাই, দুলাভাই তাঁদের খাবার দাবার দেখছি।

ওদের খাবার দাবার দেখার অনেক লোক আছে। আপনি আমারটা দেখেন, কাজ হবে। আপনারও হবে, আমারও হবে।

এবারও মেছের ঘটকের কথা বুঝতে পারল না মনজু। তবে ওই নিয়ে আর প্রশ্ন করল না। ফ্যাল ফ্যাল করে মেছের ঘটকের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

তার পাশে জায়গা দেখিয়ে ঘটক বলল, বসেন।

আলতার বাবা, তালুকদার সাহেব এসে কখন ঢুকেছেন এই ঘরে। ঢুকে ছেলের ভাই, দুলাভাইদের খাবার তদারক করছেন। নিজ হাতে খাবার টাবার তুলে দিচ্ছেন তাদের পাতে। একবার মেছের ঘটকের দিকে তাকালেন তিনি। তাকিয়ে মনজুকে বললেন, মনজু, তুই ঘটক সাহেবের ওখানে থাক। ঘটক সাহেবকে ঠিকঠাক মতো খাওয়া।

মনজু বিনীত গলায় বলল, জ্বী আচ্ছা।

মনজুর দিকে তাকিয়ে চোখ মটকে হাসল ঘটক। হল এবার! বসেন।

মনজু তার পাশে বসল। কোনটা দেব আপনাকে? খাসির রেজালা না মুরগির রোস্ট?

দেবেন তো দুরকমই। তবে আস্তে আস্তে দেন। আমি একটু রসিয়ে রসিয়ে খাই। খাওয়াটা হচ্ছে জীবনের আসল কাজ। এই খাওয়ার জন্যই দুনিয়ার যত ঝামেলা। বিয়ে শাদী ঘরসংসার গেরস্থালি, যুদ্ধ রাজনীতি সবই হচ্ছে এই খাওয়ার জন্য। খাওয়াটা খুবই বড় কাজ। বড় কাজ ভাল মতোই করা উচিত। তাড়াহুড়ো করে বড় কাজ করা ঠিক না। করলে ভালও হয় না। দেন, দু'চামচ

পোলাও দেন। টিকিয়াটা কি গরুর?
জ্বী।
ছ'খানা খেয়েছি। বেশ ভাল হয়েছে। দেন আর দু'খানা খাই।
ঘটকের প্লেটে পোলাও দিল মনজু, টিকিয়া দিল।
খেতে খেতে মেছের ঘটক বলল, আপনার নাম কী বাবাজি?
মনজু নাম বলল।
পদবী?
চৌধুরী।
তাই না কি! তাহলে তো বিরাট বংশ আপনাদের। অবশ্য আপনার চেহারা দেখে বোঝা যায় যে, আপনি বিরাট বংশের ছেলে। বাবার নাম কী?
শহীদ চৌধুরী।
শহীদ চৌধুরী নামটা শুনে মুহূর্তের জন্য খেতে ভুলে গেল মেছের ঘটক। ভুরু কুঁচকে মনজুর দিকে তাকাল। বাড়ি কোন গ্রামে বলেন তো!
এই গ্রামেই।
কামাড়খাড়া চৌধুরী বাড়ি আপনাদের?
জ্বী।
ওই চৌধুরী বাড়ির শহীদ চৌধুরী সাহেবের ছেলে আপনি?
জ্বী!
মেছের ঘটক আবার খেতে লাগল। তার পরনে শাদা পাজামা, ঘি রঙের সস্তা সিলকের পাঞ্জাবি। ডান বগলের কাছে পাঞ্জাবিটা একটু ফেঁসে গেছে। ষাটের ওপর হবে বয়স। তবু শরীর এখনও বেশ দশাসই। মাথার চুল এবং মুখের দাড়ি গোঁফ তেমন পাকেনি।
খুব আয়েশি ভঙ্গিতে মুরগির রোস্টে একটা কামড় দিল ঘটক, তারপর বলল, আপনার বাবাকে আমি খুব ভাল করেই চিনতাম। আপনার বাবার বিয়ে আমিই করিয়েছিলাম। মানে আমিই ছিলাম সেই বিয়ের ঘটক।
এই নির্জলা মিথ্যেটা বলতে অবশ্য একটু দ্বিধা হয়েছিল মেছের ঘটকের। মনজু শিক্ষিত ছেলে, মিথ্যেটা যদি ধরে ফেলে!
তবু বলল। বলে অবশ্য সামাল দিল বেশ ভালভাবে।
আপনার বাবা তো বেঁচে নেই। আমি জানি। মা তো আছেন, না?
মনজু বিনীত গলায় বলল, জ্বী বেঁচে আছেন।
আপনার মাও জানেন যে, আমিই তাঁর বিয়ের ঘটক ছিলাম।
ও আচ্ছা।
অবশ্য অতি পুরনো দিনের কথা, এখনও তিনি মনে রেখেছেন কী না কে জানে!
মনজু হাসল। কবে বিয়ে হয়েছে, বিয়ের অনুষ্ঠান কেমন হয়েছে, কে ঘটক ছিল এসব কথা বোধহয় মানুষ কখনও ভোলে না। ঠিকই মনে রাখে।
আমার মনে হয় সবাই রাখে না।
আমার মা মনে রেখেছে কী না জানতে হবে তো!
কীভাবে?
মাকে জিজ্ঞেস করব।

একথা শুনে মেছের ঘটক একেবারে আকাশ থেকে পড়ল।
বলেন কী বাবাজী। নিজের মাকে জিজ্ঞেস করবেন তাঁর বিয়ের কথা!
জিজ্ঞেস করলে কী হবে?
না না, একদম ঠিক হবে না।
কেন?
মা লজ্জা পাবেন।
এতে লজ্জা পাওয়ার কী আছে?
আছে। আপনি তা বুঝবেন না। আপনারা তো আজকালকার ছেলে, আপনাদের কাছে এসব কোনও ব্যাপার না। আগের দিনের মানুষের কাছে এগুলো খুব বড় ব্যাপার। মায়ের বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করা তো দূরের কথা, মায়ের নাম পর্যন্ত জিজ্ঞেস করত না কেউ। দেন বাবাজী, আর দু'চামচ পোলাও দেন। রেজালা দেন।
খাবার তুলে দিতে দিতে মনজু বলল, আরেকটা রোস্ট দিই।
আপনি যখন দিতে চাইছেন, দেন।
মনজু একটা রোস্ট দিল।
খেতে খেতে মেছের ঘটক বলল, যাহোক বাবাজি, এইসব বিয়ে শাদীর কথা মাকে জিজ্ঞেস করবেন না। তিনি লজ্জা পাবেন। তারচেয়ে নিজের কথা ভাবুন।
মনজু বলল, আমার কী কথা ভাবব!
আছে না, এই বয়সী ছেলেদের কত কথা ভাবার আছে না!
যেমন?
এই যেমন ধরেন বিয়ে শাদীর কথা! আপনি তো এখনও বিয়ে করেননি, তাই না?
মনজু কথা বলল না। লাজুক ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল।
মেছের ঘটক হাসলেন। এই লাইনে পাঁচচল্লিশ বছরের অভিজ্ঞতা আমার। এই চোখ দিয়ে কারও দিকে তাকালেই বুঝতে পারি সে বিবাহিত না অবিবাহিত। আপনি যে বিয়ে করেননি তা আমি আপনার মুখ দেখেই বুঝেছি। বিয়ে শাদীর কথা ভাবছেন না বাবাজি?
মনজু লাজুক গলায় বলল, আমি ভাবব কেন?
তাহলে কে ভাববে?
আমার গার্জিয়ান।
গার্জিয়ান কে?
আমার মা।
এটা তো বাবাজি আপনার আগের কথাবার্তার সঙ্গে মিলল না।
কথাটা বুঝতে পারল না মনজু। চোখ তুলে ঘটকের দিকে তাকাল। আমার কোন কথার সঙ্গে এটা মেলেনি?
ঘটক হাসল, ওই যে একবার নিজের মাকে তাঁর বিয়ের কথা জিজ্ঞেস করতে চাইলেন। আমি তাঁর ঘটক ছিলাম কী না– এসব নিয়ে কথা বলবেন বললেন।
সেসবের সঙ্গে এই বিষয়টার সম্পর্ক কী?
সম্পর্ক আছে।
কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না।
মেছের ঘটক খাওয়া শেষ করেছে। চিলমচিতে হাত ধুতে ধুতে বলল, যে ছেলে মায়ের বিয়ের

কথা মায়ের কাছ থেকে জানতে চাইতে পারে, সেই ছেলের নিজের বিয়ের কথা নিজেরই বলা উচিত। কী ঠিক বলেছি না?

এবার ব্যাপারটা বুঝল মনজু, বুঝে চারদিক তাকাল। না কেউ শুনছে না তাদের কথা। মেছের ঘটককে খেতে দেয়া হয়েছিল একটু দূরে, একটি চৌকির ওপর পাটি বিছিয়ে একেবারেই আলাদা করে। কেন এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল কে জানে! তবে এই ব্যবস্থায় মনজুর খুব উপকার হয়েছে। তার এবং মেছের ঘটকের কথাবার্তা অন্য কেউ শুনতে পায়নি। পেলে মনজু খুবই লজ্জা পেত।

ততক্ষণে পান মুখে দিয়েছে মেছের ঘটক। চিবাতে চিবাতে বলল, আমি আপনাদের বাড়ি যাব বাবাজি।

মনজু বলল, ঠিক আছে।

কেন যাব শুনবেন না?

বলুন।

আপনার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।

আচ্ছা।

আঙুলের ডগায় চুন নিয়ে দাঁত দিয়ে আঁচড়ে নিল মেছের ঘটক। আপনার মায়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের ব্যাপারে আলাপ করব।

শুনে মনজু একেবারে চমকে উঠল। জ্বী!

জ্বী।

কিন্তু আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা সম্ভব না।

কেন?

যা রোজগার করি, তাতে দু'জন মানুষেরই সংসার চলে না। বিয়ে করে বউকে কী খাওয়াব!

ওসব দেখা যাবে।

তারপর একটু থেমে ঘটক বলল, আপনি এখন করেন কী? পড়ালেখা? মানে এখনও ছাত্র?

না।

তাহলে?

তিনচার কথায় নিজের সম্পর্কে প্রায় সবই বলে দিল মনজু। শুনে পুরো মুখ ছড়িয়ে হাসল মেছের ঘটক। ঠিক আপনার মতোই একজন পাত্র খুঁজছে দিঘলীর হাসমত ব্যাপারী। মেয়ে তাঁর খুবই সুন্দর। জামাইকে চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য সবই দিয়ে দেবে তারা। আগের দিনের গল্পের মতো রাজকন্যা এবং রাজত্ব দু'টোই পাবেন আপনি। যাহোক এসব নিয়ে আমি আপনার মায়ের সঙ্গেই কথা বলব। এখন একটু তালুকদার সাহেবের সঙ্গে কথা বলি।

মনজু খুবই ভয় পেল, মামার সঙ্গে কী কথা?

না না আপনাকে নিয়ে কথা না। তাঁর মেয়ে, মানে আলতাকে কখন দেখাবে, কী বৃত্তান্ত এইসব আর কি!

মনজুর বুক থেকে যেন একটা পাথর নেমে গেল।

ফিরোজা রঙের চমৎকার একটা সিল্ক পরেছে আলতা। মুখে সুন্দর প্রসাধন। কপালে লাল গোল টিপ। মাথার চুল খোপা করা। গলায় হালকা ধরানের হার পরেছে। কানে দুল, দু'হাত ভর্তি সোনার চুড়ি। আলতার দুই বিবাহিতা খালাত বোন আলতাকে এনে বারান্দার বেতের চেয়ারটায় বসিয়ে দিল। আলতা মাথা নিচু করে বসে রইল।

মেয়ে দেখাবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ভেতর দিককার বারান্দায়। পুরনো আমলের বিল্ডিং বলে বারান্দাটা বেশ চওড়া, বেশ বড়। পাত্রপক্ষের দশ বারোজন লোক ছড়ান ছিটান চেয়ারে বসে আছে। তাদের মুখোমুখি বসেছে আলতা। তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আছে দুই খালাত বোন। বাড়ির মেয়েরা উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে দরজা জানালা দিয়ে।

আলতাদের দিককার পুরুষ মানুষ কেউ নেই ধারে কাছে। কেবল দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে, সিঁড়িতে হেলান দিয়ে উদাস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে মনজু। শেষ বিকেলের মনোরম আলোয় উজ্জ্বল হয়েছে চারদিক। গাছপালার কোন আড়াল থেকে, কিংবা দূর আকাশের কোন অচিন লোক থেকে আশ্চর্য রকমের এক টুকরো আলো এসে পড়েছে আলতার নত মুখে। হঠাৎ করেই যেন এই আলোটুকু আবিষ্কার করল মনজু। করে চমকে উঠল। মুগ্ধ চোখে আলতার দিকে তাকাল সে। তারপর আর চোখ ফেরাতে পারল না।

আলতা এত সুন্দর!

এতকাল ধরে চেনা মেয়েটি আজ হঠাৎ করে এত সুন্দর কী করে হল!

কোন ফাঁকে হল!

আলতাকে দেখতে দেখতে সব ভুলে গেল মনজু।

ঠিক তখুনি পাত্রপক্ষের একজন কী একটা প্রশ্ন করল আলতাকে। প্রশ্নের জবাব দেয়ার জন্য মুখ তুলল আলতা। চোখ তুলল। তারপর মনজুকে ওভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে সেও সব ভুলে মনজুর দিকে তাকিয়ে রইল।

৫

আলতা তার ডাগর দু'খানা চোখ তুলে মনজুর দিকে তাকিয়ে আছে। এই রহস্য অন্য কেউ বুঝে ওঠার আগেই মেছের ঘটক বলল, দেখেন, মা জননীর চোখ দু'খানা দেখেন! কী সুন্দর ডাগর চোখ! এই চোখের সঙ্গে তুলনা চলে গরুর চোখের। তাও সব গরুর নয়, অল্প বয়সী বাছুরের। মেয়ে বাছুর। বিক্রমপুর এলাকায় যাকে বলে দামড়ি গরু।

মেছের ঘটকের কথায় লজ্জা পেল আলতা। দ্রুত চোখ ফিরিয়ে নিল সে, দৃষ্টি নত করল।

মনজুরও হয়েছে একই অবস্থা। আলতা চোখ সরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও তাকিয়েছে অন্যদিকে। কিন্তু বুকের ভেতর তার কী রকম অচেনা এক আবেগ কাজ করছে। কেমন যেন লাগছে তার। একেবারেই অচেনা এক অনুভূতি হচ্ছে। বার বার তাকাতে ইচ্ছে করছে আলতার মুখের দিকে।

কী আছে আলতার ওই মুখে!

কেন বার বার এত কালের চেনা ওই মুখটি আজ দেখতে ইচ্ছে করছে! কেন মনে হচ্ছে এই মুখ আজকের আগে কখনও সে দেখেনি; এমন লাগছে কেন তার!

কী অর্থ এসবের!

সিঁড়ির রেলিং ধরে আনমনা হয়ে রইল মনজু।

আলতার চোখ নিয়ে তখনও কথা বলছে মেছের ঘটক। পাত্র পক্ষের লোকজনের সামনে রাখা আছে পেতলের বনেদি পানদান। খিলি করা চমৎকার পান সাজান আছে। এক পাশে চিকন করে কাটা সুপুরি, খয়ের, চুন, জর্দা সব রাখা আছে জায়গা মতো। দু'খানা খিলিপান এক সঙ্গে মুখে দিল মেছের ঘটক। খচখচ করে চিবাতে চিবাতে জড়ান মুখে বলল, আমি ক্লাশ এইট পাশ লোক। আগের দিনের ক্লাশ এইট আর আজ কালকার ম্যাট্রিক পাশ এক সমান। পান খাওয়ার মতো

নভেল বই পড়ার খুব অভ্যাস ছিল আমার। শরৎচন্দ্রের দেবদাস বইখানা আমি অনেকবার পড়েছি। মীর মশাররফ হোসেনের বিষাদ সিন্ধু এখনও আমাদের বাড়িতে আছে। গরু কোরবানি দেয়ার ছুরিখানা আর বিষাদ সিন্ধু বইখানা একসঙ্গে সিন্দুকে রাখা আছে। দুটো জিনিসই কাপড় দিয়ে প্যাচিয়ে রেখেছি। ছুরিটায় যাতে জং না ধরে, বইটা যাতে পোকায় না কাটে। নজিবর রহমান সাহিত্যরত্নের আনোয়ারা, গরীবের মেয়ে এইসব বই আমার মুখস্ত। মা জননীর চোখ দু'খানার তুলনা গরুর চোখের সঙ্গে না দিয়ে বইয়ের ভাষায় দেয়া ভাল। সাহিত্যিকরা বলে পটল চেরা চোখ। মা জননীর চোখ দু'খানা আসলেই পটলচেরা। একখানা পটল নিয়ে তার মাঝে বরাবর লম্বাভাবে ফালা করলে দেখতে যেমন হবে, ঠিক অমন দেখতে মা জননীর চোখ দু'খানা। কী বলেন আপনারা, ঠিক না!

পাত্রপক্ষের কেউ তেমন পাত্তা দিল না মেছের ঘটকের কথায়।

কেউ কেউ পান চিবাচ্ছে, কেউ আড়চোখে, কেউ সরাসরি দেখছে আলতাকে। তাদের দেখা সঠিক হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না মেছের ঘটকের। বিকেল শেষ হয়ে আসা আলোর যে আভাটুকু খেলা করছে আলতার মুখে, সেই আলোর দিকে তাকিয়ে মেছের ঘটক বলল, মা জননীর গায়ের রঙখানা দেখেছেন? নাম যেমন, গায়ের রঙখানাও তেমন। আলতা বরণ। আলতার সঙ্গে মিলেছে খাঁটি গরুর দুধ, মানে গরুর খাঁটি দুধ। একেবারে দুধে আলতা হয়ে গেছে। দেখেন, ভাল করে তাকিয়ে দেখেন।

পাত্রের মেজ বোনজামাই তার পাশে বসা বড় বোনজামাইকে, মানে ভায়রার কানে কানে বলল, ঘটকা শালায় কি আমাগো কানা মনে করে! আমরা চোখে দেখি না! মেয়ে তো কালো, দুধে আলতা রঙ বলার দরকার কী!

বড় জামাই হাসি হাসি মুখে ফিসফিস করে বলল, চুপ থাক।

ঘটকারা এ রকমই হয়। খালি মিথ্যা কথা বলে।

তাদের কথাবার্তা শুনতে পেল না মেছের ঘটক, তবে অনুমান করল তার কথাবার্তা বিশ্বাস করছে না কেউ বরং শুনে বিরক্ত হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে বলল, আসলে মা জননীর গায়ের রঙখানা একটু কালো। কালো হয়েছে তো কী হয়েছে। কালোই হচ্ছে আসল রঙ। ওই যে কথায় বলে না,

> 'কালো
> জগতের আলো।'

জগৎ আলো করেছে কালো রঙ। কবি গাহিয়াছেন,

> তা সে যতই কালো হোক
> দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ।

এটা যেন তেন কবির কথা না। জগত শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা। আরেক কবি গাহিয়াছেন,

> কালো যদি মন্দ
> তবে কেশ পাকিলে
> কান্দ ক্যানে।

মেছের ঘটকের কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে আছে সবাই। আলতা চোখ খুলে তাকাচ্ছেই না। মাথার অর্ধেকটা ঘোমটায় ঢেকে মুখ নিচু করে বসে আছে। ভেতর বাড়ির দরজা জানালায় উদগ্রিব হয়ে আছে বেশ কিছু নারীমুখ। কবরেজ বাড়ির মেয়ে পারুলও আছে। এসব বিষয়ে তার খুব উৎসাহ। সে চেয়েছিল আলতার সঙ্গে থাকবে। আলতার মেজখালা মানা করেছে। বলেছে, তোর গায়ের রঙ ফর্সা। তুই যদি আলতার সামনে থাকিস, তাহলে ওকে আরও কালো দেখাবে। পাত্রপক্ষ আলতাকে না দেখে তোকে দেখবে। তুই তো ওর সঙ্গে যেতে পারবিই না, এমনকি তোকে

থাকতেও হবে আড়ালে লুকিয়ে, যাতে পাত্রপক্ষের কারও চোখে তুই না পড়িস।

পারু আছেও সেইভাবে। তবে ছেলেমানুষি উচ্ছলতায় বার দু'তিনেক খিক করে হেসে ফেলেছে সে। ব্যাপারটা নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামায়নি।

শুরু থেকেই মেছের ঘটক লোকটিকে পছন্দ হয়নি মনজুর। অতিরিক্ত কথা বলা দালাল ধরনের লোক। যা মনে আসছে বলে যাচ্ছে। তার কথা লোকে পাত্তা দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, শুনছে কি শুনছে না খেয়াল করছে না, বলেই যাচ্ছে। তবু যেহেতু বিয়ে সাদীর ব্যাপার, কেউ কিছু বলছেও না তাকে। তার সব কথাই শুনে যাচ্ছে, সহ্য করে যাচ্ছে।

কিন্তু লোকটি যখন নানা রকমভাবে নিজের সাধ্যমতো জ্ঞানে আলতার প্রশংসা করে যাচ্ছিল, শুনে খুব ভালো লাগছিল মনজুর। মনে হচ্ছিল, আলতার চোখ গায়ের রঙ এবং সৌন্দর্য নিয়ে যা বলছে সে, আসলেই আলতা তাই। ঠিকই বলে যাচ্ছে মেছের ঘটক।

কিন্তু আলতা আর তার দিকে তাকায় না কেন?

পাত্রের বড় ভাই এসময় নরম করে গলা খাঁকাড়ি দিল। তারপর বলল, তোমার নাম কী বইন।

আলতা কথা বলল না।

পাশ থেকে দুই খালাত বোনের একজন আলতো করে ধাক্কা দিল আলতাকে। ফিসফিস করে বলল, নাম বল।

সেই লোকটি বলল, বল বইন, বল। আমার কাছে লজ্জা কিসের! আমি তোমার বড় ভাইয়ের মতো।

আলতা মুখ তুলল না। খুবই নিচু গলায় বলল, শাহিনা তালুকদার।

ডাক নাম?

আলতা কথা বলার আগেই মেছের ঘটক বলল, কিছুক্ষণ আগেই তো ডাক নামটা আমি বলে দিলাম। আলতা।

লোকটি কটমটে চোখে মেছের ঘটকের দিকে তাকাল। মেছের ঘটক বুঝল, নাম জানাটাই আসল কথা নয়, মেয়ের গলার আওয়াজ শুনতে চাইছে তারা। আওয়াজ কাকের মতো না কোকিলের মতো। বিষয়টি নিয়ে পাত্রের বড় ভাইকে সে সাহায্য করতে চাইল। লোকটির কটমটে চোখ পাত্তা না দিয়ে হাসি মুখে বলল, মেয়ের গলার আওয়াজ শুনতে চাচ্ছেন তো, আমি আওয়াজ বের করে দিচ্ছি। আওয়াজ একদম কোকিলের মতো। মা জননী, একখানা সূরা বল।

পাত্রের বড় বোনজামাই বলল, আরে না, এত কিছুর দরকার নাই। গলার আওয়াজ আমরা শুনছি। এমনিতেই কথাবার্তা জিজ্ঞেস করি, তার উত্তর দিলেই হবে। তুমি লেখাপড়া কোন ক্লাশ পর্যন্ত করেছ?

আলতা আগের মতোই নিচু গলায় বলল, এসএসসি পাশ করেছি?

কোন ডিভিসান?

সেকেন্ড ডিভিসান।

মেছের ঘটক বড় ভাইর দিকে তাকাল। শুনেছেন গলার আওয়াজ। একদম কোকিল।

পাত্রের চাচা কিংবা মামা, বয়স্ক একজন বললেন, দেখি খাড়াও তো মা।

আলতা নড়ল না।

খালাত বোন দু'জন দু'দিক থেকে তার দু'বাহু ধরল। অনেকটা টেনেই যেন দাঁড় করাল আলতাকে।

বয়স্ক লোকটি বললেন, মাসাল্লা ভাল লম্বা। একটুখানি হাঁট তো মা।

আলতাকে কয়েক কদম হাঁটাল তার খালাত বোনরা।

সেই লোকটি বললেন, হাঁটাচলা মন্দ না। ধীর গতি আছে।

আরেক মুরব্বি বললেন, চুলগুলি একটু ছাড় তো মা। দেখি কেমন লম্বা চুল। কেমন ঘন।

খালাত বোন দু'জন দ্রুত হাতে খুলে দিল আলতার সুন্দর খোপা। চুল খুব লম্বা নয় আলতার, কোমর ছাড়িয়ে নামল না। কোমরের কাছাকাছি নেমে শেষ হয়ে গেল।

আলতার চুল নিয়ে কেউ কোনও কথা বলল না। বোঝা গেল চুল দেখে বিশেষ খুশি হয়নি কেউ। কিন্তু মনজুর খুব ভাল লাগল আলতার চুল। মনে হল, এই চুলই ঠিক আছে। এরচে লম্বা কিংবা খাট হলে মানাত না আলতাকে।

ততক্ষণে আলতা তার চেয়ারে বসে পড়েছে।

পাত্রের মেজভাই বলল, একটু হাসেন তো!

এমন আচমকা বলল কথাটা, সবাই কী রকম একটু চমকে উঠল।

লোকটি বলল, হাসেন। হাসলে দাঁতগুলি দেখা যাবে।

হাসা তো দূরের কথা, আলতা মুখ তুলে তাকালই না। খালাত বোন দু'জন দু'পাশ থেকে ধাক্কা দিল। ফিসফিসে গলায় বলল, কীরে হাসছিস না কেন? হাস। দাঁত দেখবে তো!

আলতা নড়ল না। মাথা নিচু করে পাথরের মতো শক্ত হয়ে রইল।

এইসব বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক মেছের ঘটক। ব্যাপারটা সে সামাল দেয়ার চেষ্টা করল। হাসতে লজ্জা পাচ্ছে, বুঝলেন না। আঁতকা তো হাসি আসে না মানুষের। তবে দাঁত মা জননীর, খুব সুন্দর দাঁত। লাউয়ের বিচির মতো। দেখবেন, আপনাদের বাড়ির বউ হয়ে গেলে নিশ্চয় দেখবেন। মেছের ঘটক আর যাই করুক মিথ্যা কথা বলে না।

মেছের ঘটকের কথা কেউ পাত্তা দিল বলে মনে হল না।

তবে আলতা যে হাসেনি এজন্য মনজু খুব খুশি। ঠিকই তো করেছে আলতা! লোকে বলবে আর অমনি হাসতে হবে! আলতার হাসি কি এত সস্তা!

সেই লোকটি তখন বলল, ঠিক আছে না হাসে না হাসুক, এই যে বইনরা, একটা কাম করেন তো, পায়ের সামনে থেকে শাড়িটা একটুখানি উঠান, পায়ের গড়নটা দেখব। ময়ূর পাখির পাও কী না একটু দেখা দরকার।

সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হল বোন দু'টি। নিচু হয়ে আলতার পায়ের কাছ থেকে শাড়ি সরাবার চেষ্টা করল তারা। দু'হাতে বেশ কঠোর ভঙ্গিতে তাদেরকে বাঁধা দিল আলতা। মুখে কোনও কথা বলল না। কিন্তু আচরণে বোঝাল এ কিছুতেই সম্ভব নয়। খালাত বোন দু'টি ফিসফিস করে বলল, এমন করছিস কেন?

চাপা কিন্তু দৃঢ় গলায় আলতা বলল, না।

এটা নিয়ম।

হোক, আমি পা দেখাব না।

এবারও ব্যাপারটি সামাল দেয়ার চেষ্টা করল মেছের ঘটক। হাসিমুখে বলল, লজ্জা পাচ্ছে। মা জননী খুব লাজুক।

সেই লোকটি নির্বিকার গলায় বলল, না লাজুক না। রাগি।

শুনে ভেতরে ভেতরে কী রকম একটা রাগ হল মনজুর।

লোকটির উদ্দেশ্যে মনে মনে বলল, রাগি হয়েছে তাতে তোর কী! তুই কে রে যে তুই বললেই তোকে পা দেখাতে হবে! ময়ূরের পা কেমন হয় তুই জানিস? ময়ূর কখনও চোখে দেখেছিস!

তারপর কী যেন কী কারণে জায়গাটায় দাঁড়িয়ে থাকতে আর ভাল লাগল না মনজুর। নিঃশব্দে বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বেরিয়ে এল সে।

ওই পরিস্থিতিতেও মনজুর বেরিয়ে যাওয়াটা খেয়াল করল আলতা।

গাছপালার মাথায় চাঁদ উঠেছে।

চৈত্ররাতের উদাস হাওয়া থেকে থেকে বইছে। গাছপালার বন হা হা করছে সেই হাওয়ায়। জ্যোৎস্না কেঁপে কেঁপে যায় হাওয়ায়, গাছপালার ছায়া মানুষের মতো হাত পা ছোঁড়ে। আকাশের দিকে তাকিয়ে, গাছপালা, জ্যোৎস্না এবং ছায়ার দিকে তাকিয়ে কেন যে বুক কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল মনজুর।

মনজু বসে আছে আলতাদের পুকুর ঘাটে।

সন্ধ্যের পর পর এসে বসেছে, এখন অনেকটা রাত, ওঠার নাম নেই। উঠতে ইচ্ছে করছে না মনজুর, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে না। এমন কি খিদেও পাচ্ছে না।

এতটা রাত হয়েছে, মা নিশ্চয় মনজুর জন্য জেগে বসে আছেন। অপেক্ষা করছেন, মনজু ফিরে গেলে রাতের খাবার খাওয়া হবে, তারপর ঘুম।

কিন্তু মনজুর যেন আজ ওসব মনেই নেই। কী রকম উদাস, একাগ্র হয়ে বসে আছে।

এরকম একা, নির্জনে কোথাও বসে থাকলে গলায় গুনগুনিয়ে ওঠে গান। তার ওপর যদি জ্যোৎস্না রাত হয়, তাহলে তো কোনও কথাই নেই। গান না গেয়ে মনজু থাকে না।

আজ কিন্তু আছে।

আজ কিন্তু গান গাইতে ইচ্ছে করছে না তার।

কেন যে এমন হচ্ছে!

সন্ধ্যের মুখে মুখে, আলতাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে মনটা কী রকম খারাপ হয়ে আছে। আলতাকে দেখতে আসবে শুনে সুন্দর পাঞ্জাবি পরে, মনে বেশ একটা স্ফূর্তি নিয়ে গিয়েছিল তাদের বাড়ি। পাত্রপক্ষের লোকজনদের খাওয়া দাওয়ার তদারকি, মেছের ঘটকের সঙ্গে গল্প গুজব সবই ঠিক মতো হচ্ছিল। বেশ আনন্দ নিয়েই সব করে যাচ্ছিল মনজু। আলতাকে দেখাতে আনল, তখনও পর্যন্ত সব ঠিক আছে। তারপর আচমকাই সবকিছু কেমন উলোট পালট হয়ে গেল। বিকেল ফুরিয়ে আসা আলোর আশ্চর্য এক টুকরো রেখা এসে পড়ল আলতার মুখে, সেই আলোয় মুহূর্তেই যেন অচেনা, অন্য এক জগতের মানুষ হয়ে গেল আলতা। এতকালের চেনা মেয়েটি আর চেনা রইল না। অচেনা মানুষ হয়ে গেল, দেবী হয়ে গেল।

আলতার দিক থেকে তারপর আর চোখ ফেরাতে পারেনি মনজু। মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে থেকেছে। মনের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠেছে মান্না দে'র গান।

> ও কেন এত সুন্দরী হল!
> অমনি করে ফিরে তাকাল
> দেখে তো আমি মুগ্ধ হবই!

সে না হয় আলতার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল, আলতা কেন অমন করে তাকিয়েছিল তার দিকে! চারপাশে এত লোকজন, পাত্রপক্ষ দেখছে তাকে আর সব ভুলে সে দেখতে লাগল মনজুকে!

কেন?

ওরকম পরিবেশে কেন ওভাবে মনজুকে দেখছিল সে!

কী দেখছিল!

মান্না দে'র গানের মতো করে আলতাকে কি কখনও তার জিজ্ঞেস করা হবে,

> কী দেখলে তুমি আমাতে!

এসব ভেবে মনের ভেতর তারপর থেকে এক উথাল পাথাল ঝড় বইছে মনজুর। প্রতিদিনকার চেনা জীবন এবং অনুভূতি যেন হঠাৎ করেই বদলে গেছে।

মনজুর কিছু ভাল লাগে না।

মনজুর বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না।

রাত গভীর হয়। চাঁদের আলো আর চৈতালি হাওয়ায় নির্জন হয় চারদিক। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায় বাদুড়, রাত পাখি। চাঁদের আলোকে দিনের আলো মনে করে ডেকে ওঠে মতিভ্রম কোনও পাখি। পুকুরের নির্জন প্রান্তে চড়তে বেরুনো ডাহুক একাকী কুক কুক করে সঙ্গীকে ডাকে। আততায়ী শেয়াল ঘোরাফেরা করে তার অদূরে। গাছপালার বন মুখর হয় ঝিঁঝির ডাকে। হাওয়ায় ভেসে আসে অচেনা ফুলের মিষ্টি গন্ধ।

এসময় ফুলের মৃদু সুবাসের মতো নিঃশব্দ পায়ে, চাঁদের আলো এবং গাছের ছায়া ভেঙে কে একজন একা দাঁড়িয়ে মনজুর সামনে। মনজু ছিল উদাস আনমনা। ফলে আচমকা একজন মানুষ দেখে চমকে ওঠে। কে?

মৃদু কণ্ঠে সেই মানুষ বলল, আমি।

আলতা, তুমি এত রাতে এখানে?

৬

আলতা কোনও কথা বলল না।

মনজু ততক্ষণে কী রকম যেন দিশেহারা হয়েছে। প্রথমে তার বিশ্বাসই হয়নি, এত রাতে পুকুর ঘাটের নির্জনতায় যে মানুষটি তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেই মানুষটি আলতা। আজ বিকেলের ফুরিয়ে আসা আলোয় পাত্রপক্ষের অদূরে দাঁড়িয়ে যে মানুষটিকে দেখে সে মুগ্ধ হয়েছে। আলতা যে এত সুন্দর এ কথা আজ বিকেলেই সে প্রথম জেনেছে। যে মানুষকে নিয়ে তারপর থেকে কেবলই ভেবেছে মনজু, নিজের অজান্তেই যে মানুষকে নিয়ে গান গাইতে শুরু করেছিল, সেই মানুষ কী না এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে! তাও গভীর রাতে, একা, নির্জনে।

এসব ভেবেই কী না কে জানে, দিশেহারা ভাব কেটে আশ্চর্য রকমের একটা ঘোর লেগে গেল মনজুর। অপলক চোখে আলতার দিকে তাকিয়ে রইল সে।

চাঁদের আলো তখন দিবালোকের মতো প্রখর। কৃষ্ণচূড়ার বন্যায় বুঝি চৈতালি ভেসে যায়। ফুলগন্ধে বিভোর হয় চরাচর।

মনজুকে তাকিয়ে থাকতে দেখে আলতাও তাকায় মনজুর দিকে। সেও তাকিয়ে থাকে অপলক চোখে।

এভাবে কতটা সময় কাটে কে জানে! এক সময় চোখের ঘোর কেটে যায় মনজুর। এতক্ষণ বসেছিল সে, আলতা ছিল দাঁড়িয়ে। ঘোর কাটতে মনজুও উঠে দাঁড়াল। আবার বলল আগের কথাটি।

আলতা, তুমি এত রাতে এখানে?

আলতা যেন একটু কেঁপে উঠল। মৃদু মোলায়েম স্বরে বলল, হ্যাঁ। আমি এত রাতে এখানে!

কেমন করে এলে?

ওসব আপনার জানবার দরকার কী?

কথাটা যেন বুঝতে পারল না মনজু। বলল, জানবার দরকার কী মানে? তোমার বয়সী একটি মেয়ে একা এত রাতে পুকুর ঘাটে এসেছে। কেমন করে এসেছে, কেন এসেছে জানতে চাইব না?

আলতা উদাস গলায় বলল, তা তো চাইবেনই। আপনি পুরুষ মানুষ। এসবই তো জানতে চাইবেন। আসল কথাটা জানতে চাইবেন না।

তোমার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

এবার যেন একটু রাগল আলতা। বলল, আমিও আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

কেন বুঝতে পারবে না? আমি তো ঘুরিয়ে প্যাচিয়ে কিছু বলিনি। খুব সরল করে বলেছি।

আমিও খুব সরল করে বলেছি। এত রাতে একা একটি মেয়ে কেন একজন পুরুষ মানুষের কাছে এসে দাঁড়ায়, পুরুষ মানুষটি কেন তা বুঝতে পারবে না? এ তো অশিক্ষিত পুরুষদেরও বোঝার কথা। আর আপনি তো একজন শিক্ষিত মানুষ।

আলতার কথা শুনে বুকটা কেমন কেঁপে উঠল মনজুর। সে কোনও কথা বলতে পারল না।

আলতা বলল, আমাদের বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে।

মনজু কোনও রকমে বলল, এত তাড়াতাড়ি?

খুব একটা তাড়াতাড়ি ঘুমোয়নি। এখন অনেক রাত। তাছাড়া বাড়িতে আজ এ রকম একটা ব্যাপার ছিল, বেশ খাটাখাটনি গেছে সবার। এজন্য হয়ত একটু তাড়াতাড়িই ঘুমিয়ে পড়েছে।

তুমি ঘুমোওনি কেন?

এই প্রশ্ন তো আমিও আপনাকে করতে পারি।

ঘাটলার বাঁধান বেঞ্চে বসল আলতা। বসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কথা বলছেন না কেন?

মনজু একটু থতমত খেল। কী বলব?

আমার প্রশ্নের উত্তর দিন।

কী প্রশ্ন তোমার তাই তো বুঝতে পারছি না।

এত রাত হয়েছে এখনও বাড়ি ফিরে যাননি কেন আপনি? ঘুমোননি কেন?

এমনি।

এমনি নয়, নিশ্চয় কারণ আছে।

না কোনও কারণ নেই।

কেন অযথা মিথ্যে বলছেন।

মিথ্যে বলব কেন!

তাহলে?

আসলে ঘুম পাচ্ছে না।

কেন?

মনটা যেন কেমন হয়ে আছে।

কখন থেকে?

ওই তো বিকেল থেকে।

বিকেলে তো আপনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন?

হ্যাঁ।

তার মানে আমাদের বাড়ি থেকেই আপনার মন খারাপ হয়েছে?

মনজু কথা বলল না।

আলতা বলল, কথা বলছেন না কেন?

মনজু এবার ভয় পাওয়া গলায় বলল, আলতা, আমার কেমন ভয় করছে।

আলতা একটু অবাক হল। কিসের ভয়?

তুমি বুঝতে পারছ না?

না।

তুমি এত রাতে এভাবে পুকুরঘাটে এসেছ! কেউ দেখে ফেললে?

ভয়টা কী আপনি আমার জন্য পাচ্ছেন, না নিজের জন্য?

দু'জনের জন্যই। তবে তোমার জন্য বেশি। তুমি একটি মেয়ে। বিয়ের কথাটথা হচ্ছে তোমার। এ সময় কেউ যদি তোমাকে নিয়ে কোনও বাজে কথা রটায়!

রটালে রটাবে।

কিন্তু তাতে তোমার খুব ক্ষতি হবে।

কী ক্ষতি হবে?

বিয়ে ভেঙে যাবে।

ভাঙুক।

মানে?

আমি চাই আমার বিয়ে ভেঙে যাক।

কেন?

আপনি বোঝেন না কেন?

মনজুর বুকটা আবার কেঁপে উঠল।

আলতা বলল, দাঁড়িয়ে রইলেন যে! বসুন। আমার পাশে বসুন।

মনজু কাতর গলায় বলল, আলতা!

আপনি এত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? আপনাকে কোনও বিপদে আমি ফেলব না।

তারপর একটু থেমে আলতা বলল, যদি আপনার জন্য আমি কোনও বিপদে পড়ি, আপনি আমাকে সাহায্য করবেন না? দাঁড়াবেন না আমার পাশে?

মনজু কথা বলল না।

আলতা বলল, কথা বলছেন না কেন?

মনজু বলল, কী বলব বল!

আমি যা জানতে চাইছি– তার জবাব দিন।

মনজু তবু কথা বলল না।

হাত বাড়িয়ে মনজুর একটা হাত ধরল আলতা। বসুন, আমার পাশে বসুন।

মনজু বসতে বসতে বলল, তোমার আচরণটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না আলতা।

কেন যে বুঝতে পারছেন না– আমি তা বুঝতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছে বুঝতে আপনি ঠিকই পারছেন। কিন্তু বুঝেও না বোঝার ভান করছেন।

আসলে আমার খুব ভয় হচ্ছে।

পুরুষ মানুষ হয়ে এই বয়সী একটি মেয়ের সামনে বারবার ভয়ের কথা বলছেন, লজ্জা করছে না আপনার! কেমন পুরুষ আপনি? এত রাতে এত মানুষের চোখ ফাঁকি দিয়ে, কোনও কিছু না ভেবে, মান-সম্মান ভয় কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে আমি আপনার কাছে এসেছি আর আপনি বারবার ভয়ের কথা বলছেন! আমার কথাটা একবারও ভাবছেন না! কেন এভাবে আপনার কাছে এসেছি আমি জানতে চাইছেন না?

চেয়েছি তো, তুমি বলছ না। তুমি হেয়ালি করছ।

আমি কোনও হেয়ালি করিনি। আমি বলেছি আপনি বুঝতে পারেননি আমি কেন এসেছি।

না আমি বুঝতে পারিনি।
সত্যি বুঝতে পারেননি?
না।
আলতা আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। আমার ওই কথাটাই ঠিক।
কোন কথাটা ?
পুরুষ মানুষেরা সবই বুঝতে পারে, বুঝতে চায়। কেবল মেয়েদের আসল জিনিসটা বুঝতে পারে না, বুঝতে চায় না।
মেয়েদের আসল জিনিস কোনটা?
সেকথা বলা মেয়েদের জন্য সব চাইতে লজ্জার, সব চাইতে অপমানের । তবুও আমার মনে হয় সব অপমান, লজ্জার মাথা খেয়ে আপনাকে আমার আজ তা বলতে হবে। আপনি শরৎচন্দ্রের দেবদাস বইটা পড়েছিলেন?
হ্যাঁ।
এক রাতে পার্বতী যে দেবদাসের ঘরে গিয়েছিল মনে আছে আপনার ?
আছে।
কেন গিয়েছিল মনে আছে?
আছে।
আমিও সেরকম একটা কারণেই এসেছি।
এবার মনজু যেন একেবারেই বিব্রত হয়ে গেল, থতমত খাওয়া গলায় বলল, কিন্তু দেবদাসের সঙ্গে তো পার্বতির একটা ভাব ছিল।
শুধু ভাব নয়, ভালবাসা ছিল।
হ্যাঁ। ওজন্যই অতরাতে ওভাবে সে গিয়েছিল। কিন্তু তোমার সঙ্গে তো আমার....
কী?
না মানে....
কথাটা শেষ করুন। আমার সঙ্গে আপনার ভাব নেই, ভালবাসা নেই- এই তো বলবেন?
মনজু কথা বলল না।
আলতা বলল, যা হোক, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব। আপনি দয়া করে আমার প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবেন। দেবেন তো?
দেব।
সত্যি?
সত্যি।
কোনও রকমের চালাকি কিংবা মিথ্যে কথা বলবেন না।
বলব না।
আমাকে ছুঁয়ে বলুন।
আলতা তার ডান হাতখানা মনজুর দিকে বাড়িয়ে দিল।
কিন্তু মনজুর কী রকম একটা দ্বিধা হয়। আলতার হাত সে ছুঁতে পারে না। আড়ষ্ট হয়ে থাকে।
আলতা বলল, কী হল?
মনজু একটু নড়েচড়ে উঠল। না কিছু না।
তাহলে আমার হাত ধরছেন না কেন? আমাকে ছুঁয়ে বলছেন না কেন কথাটা।

হাত ছুঁতে হবে না। এমনিতেই বলব।

আলতার আবার একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল। সত্যি অদ্ভুত মানুষ আপনি। একটি মেয়ে আপনার দিকে হাত বাড়িয়েছে আর আপনি তার হাত ধরছেন না! ভয় পাচ্ছেন ! ভুলে গেলেন খানিক আগে মেয়েটিই আপনার হাত ধরেছিল! হাত ধরে তার পাশে আপনাকে বসিয়েছে!

মনজু কথা বলল না।

আলতা বলল, যা বোঝার আমি বুঝে গেছি।

মনজু জড়ান গলায় বলল, কী বুঝেছ তুমি?

দুঃখ ছাড়া আপনার কাছ থেকে কিছুই পাওয়ার নেই আমার।

দুজনেই চুপ করে থাকে তারপর। কেউ কোনও কথা বলে না। চৈত্ররাতের চাঁদ এখন আরও উজ্জ্বল, আরও প্রখর। হাওয়ায় হা হা করে গাছপালা। মাথার ওপর দিয়ে বাদুড় উড়ে যায়। পুকুর পাড়ের জঙ্গলে একাকী ডেকে যায় এক ডাহুকি। রাত নির্জন হয় নিজস্বতায়।

আলতা বলল, যা হোক আমার প্রশ্নগুলো এবার আমি করি। বহুদিন ধরে কোনও কোনও রাতে আমাদের ঘাটলায় বসে এক একা গান করেন আপনি। কেন করেন?

মনজু বলল, তেমন কোনও কারণ নেই। গান গাইতে আমার ভাল লাগে।

কিন্তু আমাদের ঘাটলায় বসে কেন গান? অন্য কোথাও বসেও তো গাইতে পারেন!

তা তো পারিই।

তাহলে?

এই জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগে। এখানটায় এসে বসলেই মনটা ভাল হয়ে যায়। মনের ভেতর গুনগুনিয়ে ওঠে গান। আমি সব ভুলে যাই। আমার কেবলই গান গাইতে ইচ্ছে করে।

কিন্তু আপনার গান যে একজন মানুষের ক্ষতি করতে পারে– আপনি কখনও তা ভেবেছেন!

একথা শুনে মনজু খুব চমকাল। গান কী করে মানুষের ক্ষতি করে? গান যে মানুষের ক্ষতি করতে পারে এমন কথা আমি কখনও শুনিনি।

আজ শুনুন। গান সত্যি সত্যি মানুষের ক্ষতি করতে পারে। আপনার গান একজন মানুষের খুব ক্ষতি করেছে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ।

কার বল তো?

আপনি বুঝতে পারেননি?

না।

একটু থেমে গভীর গলায় আলতা বলল, আমার।

কথাটা যেন বুঝতে পারল না মনজু। বলল, কী বলছ আলতা!

ঠিকই বলছি। আপনার গান আমার খুব ক্ষতি করেছে।

কী ক্ষতি করেছে?

সে কথা বুঝিয়ে বলা খুব মুশকিল।

না বললে আমি বুঝব কী করে?

যে সব রাতে আপনি আমাদের ঘাটলায় বসে গান করেছেন– সেসব রাতে এক মিনিটের জন্যও ঘুমোতে পরিনি আমি। শুধু আপনার কথা ভেবেছি। যখন চোখ একটু লেগে এসেছে, তন্দ্রা মতো এসেছে, তখন কেবল আপনাকে স্বপ্ন দেখেছি। আপনি ঘাটলায় বসে উদাস হয়ে গান গাইছেন,

আমি ঘর অন্ধকার করে জানালায় দাঁড়িয়ে শুনছি, কতদিন চোখের জলে গাল ভেসে গেছে আমার! নিঃশব্দে কত যে কান্না আপনার গান শুনে আমি কেঁদেছি! রাতের খাবার খেতে মা আমায় ডেকেছে, আমি শুনতে পাইনি। কখনও কখনও শুনতে পেয়েও খেতে যাইনি। আমার খেতে ইচ্ছে করেনি। শুতে ইচ্ছে করেনি। আমার কেবল ইচ্ছে করেছে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি আমি। আপনার কাছে চলে আসি, ঘাটলায় চলে আসি। এসে আপনার হাত ধরে আপনার পাশে বসে থাকি। আপনার মুখের দিকে তাকিয়ে আপনার গান শুনি।

আলতার কথা শুনতে শুনতে মনজু যেন বাকরুদ্ধ হয়ে গেছে, বোবা হয়ে গেছে। সে যেন কথা বলতে পারে না। সে যেন নড়তে পারে না। বুকের ভেতর কী রকম একটা থম ধরা ভাব। চোখের ভেতর কী রকম এক সূক্ষ্ম জ্বালা, এই চোখে পলক ফেলতে ভুলে যায় মনজু।

আলতা বলল, যতদিন আপনার গান শুনেছি, ততদিন এই অনুভূতি হয়েছে আমার। আপনার কাছে চলে আসতে ইচ্ছে করেছে। জোর করে নিজেকে ঘরে আটকে রেখেছি আমি। শাসনে রেখেছি নিজেকে। আজও রাখতে চেয়েছি। পারিনি। আজ আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আজ আমি আপনার কাছে চলে এসেছি। অবশ্য আজ আপনার কাছে না এসে আমার কোনও উপায়ও ছিল না। দিনের পর দিন একই কষ্ট আমি আর সইতে পারছিলাম না। তাছাড়া .....। কথাটা শেষ করল না আলতা। থেমে গেল।

মনজু আকুল গলায় বলল, তাছাড়া কী?

আজ আপনার গান শুনে অন্য একটা কথা মনে হয়েছে আমার ।

কী কথা?

এতদিন আপনি গান গেয়েছেন নিজের মনে, নিজের ভাল লাগায়। কারও কথা না ভেবে। কিন্তু আজ আপনি গান গেয়েছেন আমার কথা ভেবে। আমাকে উদ্দেশ্য করে।

আলতার এ কথায় আপাদমস্তক কেঁপে উঠল মনজু। কোনও রকমে বলল, কী বলছ আলতা?

ঠিকই বলছি। আপনি শুধু বলুন আমার কথা মিথ্যে নয়। আমার কথা সত্য। আপনি আমার সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করেছেন আপনি আমাকে মিথ্যে বলবেন না।

মনজু কোনও কথা বলল না। মনজু মাথা নিচু করে বসে রইল।

আলতা বলল, আমার জন্য অমন উদাস হয়ে গান গায় যে মানুষ– তার কাছে কি আমি না এসে পারি! আজ আমি এজন্যই এভাবে এসেছি। কোনও কিছু ভাবিনি। আমার কোনও সামাজিক ভয় নেই। দুর্নামের ভয় নেই। মা বাবার ভয়ও নেই আমার। আমি আমার ভাল লাগার মানুষের কাছে চলে এসেছি। আমি আমার মনের মানুষের কাছে চলে এসেছি।

মনজু আগের মতোই বাকরুদ্ধ হয়ে রইল।

এত রাতে আলতার ঘরের দরজা খোলা কেন?

এত রাতে কোথায় গেল সে?

রাতের বেলা একা বাথরুমেও যায় না আলতা। ভয় পায়। এ বাড়ির বাথরুম একটু দূরে। রাতের বেলা বাথরুমে যেতে হলে বাড়ির পুরনো ঝি বারেকের মাকে ডেকে নেয়। বারেকের মা অবশ্য শোয় আলতার ঘরের মেঝেতে।

আজ শোয়নি।

আজ বাড়িতে অনেক অতিথি। আলতার ঘরে শুয়েছে আলতার ছোট খালা চায়না।

তাহলে চায়নাকে নিয়ে কি বাথরুমে গেল আলতা!

খোলা দরজা দিয়ে আলতো করে আলতার ঘরে ঢুকলেন রোকেয়া। ঢুকে চমকে উঠলেন।

আলতার বিছানার এক পাশে নিঃসাড়ে ঘুমুচ্ছে চায়না।
আলতা তাহলে কোথায় গেল?
এত রাতে, একা কোথায় গেল আলতা ?

৭

রোকেয়া কী রকম দিশেহারা হলেন!
এত রাতে আলতাকে কখনও একা কোথাও যেতে দেখেননি তিনি। মেয়েটি এমনিতে খুব চঞ্চল, ছটফটে স্বভাবের। খুব ছুটোছুটি করে, হৈ চৈ করে। শালিখ পাখির মতো লাফায়। এখনও শিশুর মত হি হি করে হাসে। হঠাৎ করে দেখে বেশ সাহসী ডাকাবুকো মেয়ে মনে হয়। আসলে তা নয়। আসলে আলতা বেশ ভীতু মেয়ে। এখনও চারদিকে যখন মেঘ করে আসে, ঝড় ওঠার আগে থম ধরে প্রকৃতি, আলতার মুখ ভয়ে শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ার আগে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, সেই বিদ্যুতের ছটায় হাসিমুখ অন্ধকার হয় তার। ভয়ে জড়সড় হয়ে দু'কানে আঙুল দেয় সে। বাজপড়ার শব্দে মা, বাবা কিংবা বারেকের মা– যাকে সামনে পায় জড়িয়ে ধরে।
ছেলেবেলায় তো রীতিমতো কান্নাকাটি করত। বাজপড়ার শব্দে মায়ের বুকে মুখ লুকাতো। ভয়ে থরথরিয়ে কাঁপত। রোকেয়া নানা রকমভাবে তাকে বোঝাত, সাহস দিত। তবুও ভয়টা কাটত না আলতার।
আর ছিল ভূতের ভয়।
সন্ধের পর একা কোনও ঘরে ঢুকত না, একা কোনও ঘরে থাকত না আলতা। একা উঠোন বাগানের দিকে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। বাথরুমে গেলে কাউকে না কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে হত সামনে। অনেকটা বয়স পর্যন্ত মা বাবার ঘরে থেকেছে সে। তারপর অন্য ঘরে থাকার অভ্যেস করেছে ঠিকই কিন্তু একা নয়, সঙ্গে বারেকের মাকে থাকতে হয়।
সেই মেয়ে একা এত রাতে আজ কোথায় গেল!
এ কী করে সম্ভব যে একা এত রাতে ঘর থেকে বেরিয়েছে আলতা! রোকেয়া খুবই উতলা হলেন। কী করবেন তিনি! স্বামীকে ডাকবেন! নাকি বারেকের মা, চায়না ওদেরকে ডাকবেন। ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, আলতা কোথায়!
কিন্তু ওদেরকে ডাকতে গেলেই তো বাড়িতে একটা সাড়া পড়ে যাবে। কথাবার্তার শব্দে স্বামীর ঘুম ভেঙে যাবে। একে একে জেগে উঠবে সবাই। সবাই জেনে যাবে আলতা ঘরে নেই। এই এত রাতে একা কোথায় চলে গিয়েছে সে! হয়ত কিছুই না, তবু হয়ত কাল এই নিয়ে পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে নানা রকমের কথা রটবে। হয়ত এ বাড়িরই ঝি চাকররা কেউ কথা প্রসঙ্গে কাউকে বলবে। কথায় কথায় নানা রকমের রঙ পাবে ব্যাপারটি। হয়ত মেয়েটির চরিত্র নিয়ে কথা উঠবে। যেদিন পাত্রপক্ষ দেখতে এল মেয়ে, সেদিনই এই ঘটনা! গ্রামের মানুষদের তো মুখ ভাল না। নানা রকমের কথা রটিয়ে বিয়েটা ভেঙে দেবে মেয়ের।
এইসব ভেবে কাউকে ডাকলেন না রোকেয়া। একাকী নিঃশব্দে মেয়েকে খুঁজতে লাগলেন।

আলতা বলল, আমার আরও কিছু কথা আছে।
মনজু উদাস গলায় বলল, বল।
কথা নয় কিছু প্রশ্ন করার আছে আপনাকে।
কর।

প্রশ্নগুলোর উত্তর আপনি সরাসরি দেবেন। ঘুরিয়ে প্যাচিয়ে কথা বলবেন না। ঘোরান প্যাচান কথা শুনে সেই কথার ভেতর থেকে আসল কথা খুঁজে বের করার মতো সময় আমার নেই।

ঘুরিয়ে প্যাচিয়ে কথা আমি তোমাকে বলব না।

তাহলে বলুন বিকেল থেকে আপনার আজ মন খারাপ কেন?

চোখ তুলে আলতার দিকে তাকাল মনজু। আমতা গলায় বলল, কী করে যে বলি!

কেন বলতে অসুবিধা কী?

এভাবে এসব কথা কখনও কাউকে বলিনি তো!

আমি এতক্ষণ যেসব কথা আপনার সঙ্গে বলেছি, ওসব কথা কিংবা ওই ধরনের কথা কি আমি কখনও কারও সঙ্গে বলেছি!

মনজু কথা বলল না।

আলতা বলল, বলিনি। জীবনে এমন কিছু কথা থাকে– যা কেবল একজন মানুষকেই বলা যায়। আমার কথাটাও তেমন।

আলতা আশ্চর্য রকমের সুন্দর চোখ করে মনজুর দিকে তাকাল। সেই কথাটা কি আমাকে বলা যায়?

যায়। কেবল তোমাকেই বলা যায় সেই কথা।

তাহলে বলুন।

বিকেলবেলা আমার আজ মন খারাপ হয়েছিল তোমার জন্য। কেন, আমি আপনার কী করেছি। খুব বড় ক্ষতি তুমি আমার আজ করেছ।

কী ক্ষতি করেছি?

তোমাদের ঘাটলায় বসে গান গেয়ে যে ক্ষতি দীর্ঘদিন ধরে তোমার আমি করেছি, ঠিক তেমন ক্ষতিই তুমি আমার আজ করেছ।

ক্ষতিটা কীভাবে করেছি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

অমন করে কেন আমার দিকে তাকিয়ে ছিলে তুমি?

আমার কথা আমি একটু পরে বলি। তার আগে আপনি বলুন, আপনি কেন তাকিয়ে ছিলেন?

তোমাকে দেখে কেমন যেন একটা অনুভূতি হয়েছিল আমার। কী যে সুন্দর তোমাকে আজ লেগেছিল! তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম আমি। তুমি যে এত সুন্দর এ আমি জানতাম না। তুমি যে এমন সুন্দর এ আমি আগে কখনও দেখিনি। এজন্য তোমার দিক থেকে চোখ সরাতে পারিনি আমি।

এজন্য ঘাটলায় বসে ওই গান গেয়েছিলেন আজ? ও কেন এত সুন্দরী হল।

হ্যাঁ।

আর মন কেন খারাপ হয়েছিল?

লোকগুলো ওরকম বিশ্রীভাবে তোমাকে দেখছে।

দেশগ্রামে পাত্রী তো এভাবেই দেখা হয়।

হোক গিয়ে। একটা পর্যায়ে ব্যাপারটা আমি আর মেনে নিতে পারছিলাম না।

এজন্য অমন করে চলে গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

আপনি ওভাবে চলে যাওয়ায় আমার যে খুব মন খারাপ হয়েছিল– সে কথা আপনি জানেন?

না তো! তোমার কেন মন খারাপ হবে?

আমার ব্যাপারটা হয়েছিল অন্য রকম। ওদের সামনে অমন সাজগোজ করে বসার পর যখন আপনার দিকে চোখ পড়ল, যখন দেখলাম জীবনে এই প্রথম অমন মুগ্ধ চোখে আপনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন, দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমি সব ভুলে গেলাম। সব ভুলে আমিও তাকিয়ে রইলাম আপনার দিকে। ওরা কে কী বলছে, না বলছে– কিছুই আসলে শুনতে পাচ্ছিলাম না আমি। আমি মগ্ন হয়েছিলাম আপনার ভাবনায়। আর.......।

কথাটা শেষ করল না আলতা। থেমে গেল।

মনজু বলল, আর?

আর একটা কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে আমার খুব ভাল লাগছিল।

কী কথা ভেবে?

আমার মনে হচ্ছিল, অন্য কেউ আমাকে দেখছে না, আমাকে দেখছেন শুধু আপনি। আমার যে মনের মানুষ সে আমাকে দেখছে। আমি যাকে চাই সে-ই কেবল দেখছে আমাকে।

মনজু কাতর গলায় বলল, এভাবে বল না আলতা।

কেন বলব না?

চাইলেই তো সবকিছু পায় না মানুষ।

আলতা দৃঢ় গলায় বলল, চাইলেই পায়।

মনজু কথা বলল না।

আলতা গভীর গলায় বলল, আপনি কি আমাকে চান?

একথার জবাব দেয়ার সাহস আমার নেই।

কেন নেই?

যা অসম্ভব তা আমি চাইব কেন?

সম্ভব অসম্ভবের কথা পরে। আগে আপনি আমার কথার উত্তর দিন।

তাহলে তুমি আমাকে আগে বল।

কী বলব?

তুমি কি আমাকে চাও?

একটি মেয়ে যদি কাউকে না চায়, তাহলে এভাবে এত রাতে কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে চলে আসে! তারপরও আমি আপনাকে সরাসরিই বলছি, আমি আপনাকে চাই। শুধু আপনাকেই চাই।

আমিও চাই তোমাকে।

সত্যি?

সত্যি। এরচে' বড় সত্য আমার জীবনে আর কিছু নেই।

আমার হাত ধরে বলুন।

আলতা তার ডানহাত মনজুর দিকে বাড়িয়ে দিল।

এবার দু'হাতে আলতার বাড়ান হাত ধরল মনজু। কিন্তু চাইলেই কি তোমাকে আমি পাব!

মনজু তার হাত ধরার পর শরীর এবং মনে অদ্ভুত এক অনুভূতি হল আলতার। শরীরের ভেতর কেমন করতে লাগল তার, মনের ভেতর কেমন করতে লাগল। আলতার ইচ্ছে হল, এ হাত ছাড়িয়ে দু'হাতে মনজুর গলা জড়িয়ে ধরে সে। মুখটা লুকোয় মনজুর বুকে। কিন্তু এসবের কিছুই করা হল না তার। তার আগেই মনজু গভীর গলায় ডাকল, আলতা।

আলতা একটু কেঁপে উঠল। উঁ।

বললে না?

কী বলব?

তোমাকে আমি কেমন করে পাব? তোমার তো বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

এই বিয়ে আমি ভেঙে দেব।

কেমন করে?

বলব এই বিয়েতে আমি রাজি নই।

তাহলে অন্য জায়গায় ছেলে দেখবেন তোমার মা বাবা।

সে বিয়েও ভেঙে দেব।

এভাবে কতবার ভাঙবে?

যতবার তাঁরা ঠিক করবেন।

এটা আসলে ছেলেমানুষি।

তা ঠিক। আপনি আমাকে কী করতে বলেন?

এটা আমার ওপর চাপাচ্ছ কেন? এটা তো তোমারই ভাববার কথা।

মনজুর এ কথায় আলতা কী রকম একটা ধাক্কা খেল। আসলেই তাই। এটা আমারই ভাববার কথা। কিন্তু ব্যাপারটা হল কী, আপনি আমার হাত ধরার পর আমার হঠাৎ করেই মনে হল, যে মানুষ এভাবে আমার হাত ধরতে পারে, আমার সব ভাবনা আমি তার ওপর চাপিয়ে দিতে পারি। এজন্যই ওভাবে বলেছি। শুনুন আমি ভাবছি, আপনাকে নিয়ে মার সঙ্গে কথা বলব আমি। মাকে সরাসরি আপনার কথা বলব।

কী বলবে?

বলব আমি আপনাকে চাই।

এত সরাসরি কেউ মাকে এসব কথা বলতে পারে?

এত সরাসরি আমি বলবও না।

তাহলে কীভাবে বলবে?

বলব, মা, অন্য কোথাও আমার বিয়ের চেষ্টা তোমরা কর না, অন্য কোথাও বিয়ে আমাকে তোমরা দিতে পারবে না। আমার যদি বিয়ে হয়, তাহলে মনজু ভাইর সঙ্গেই হবে। অন্য কাউকে বিয়ে আমি করব না।

তোমার মা বাবা যদি রাজি না হন?

কেন হবেন না? অসুবিধা কী? পাত্র হিসেবে কার চে' খারাপ আপনি! আপনি লেখাপড়া জানা ছেলে। ভাল বংশ আপনাদের।

কিন্তু আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। আমাদের সবকিছুই তোমার মা বাবা জানেন।

আর্থিক অবস্থা বাবা ঠিক করে দেবেন।

কীভাবে?

আমি আমার মা বাবার একমাত্র মেয়ে, আমার বর কী করবে না করবে বাবা তা দেখবেন না? নিশ্চয়ই দেখবেন। ওসব নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না। শুনুন, আমি ভাবছি দু'একদিনের মধ্যেই আপনার কথা মাকে জানাব। আমার মা আমাকে খুব ভালবাসেন। আমার সুখের জন্য সব করবেন মা। বাবাকে রাজি করাবার দায়িত্ব আমি মার ওপর ছেড়ে দেব।

তারপরও যদি তোমার বাবা রাজি না হন?

তাহলে আপনার হাত ধরে যেদিকে দু'চোখ যায় চলে যাব আমি।

কথাটা এমন ভাবে বলল আলতা, মনজু আর কোনও কথা বলতে পারল না। আলতার হাত ধরে

চুপচাপ বসে রইল সে।

আলতা বলল, কথা বলছেন না কেন?

মনজু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কী বলব?

ওভাবে যেতে চাইলে আপনি আমাকে নিয়ে যাবেন না?

কেমন করে যাব বল!

মানে?

আমার মা! মাকে আমি কার কাছে রেখে যাব?

এবার আলতাও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সত্যি। এদিকটা আমি ভেবে দেখিনি। আমি ছিলাম শুধুমাত্র আমার ভাবনায়। আমার আবেগে।

মনজু কোনও কথা বলল না।

খানিক চুপ করে থেকে আলতা বলল, যাহোক এসব ভেবে এখন আর চিন্তিত হওয়ার দরকার নেই। আমি আমার মতো করে এসেছি। দেখা যাক কী হয়। আমার মেঝো মামা থাকেন ঢাকায়। তার মেয়ে টিংকু ইমদাদুল হক মিলনের খুব ভক্ত। মিলনের প্রায় সব বই টিংকুর কাছে আছে। বাংলা একাডেমীর বইমেলায় টিংকু একবার ইমদাদুল হক মিলনের অটোগ্রাফ নিয়েছিল। মিলন তাঁর 'নূরজাহান' বইতে টিংকুকে লিখে দিয়েছিলেন 'ভালোবাসা থাকলে সব হয়'। বইটা টিংকু আমাদের সবাইকে দেখিয়েছে। কথাটা এত ভাল লেগেছে আমার! সত্যি, আমি বিশ্বাস করি, আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি, ভালবাসা থাকলে সব হয়। ভালবাসার শক্তিতে আমারও সব হবে। আমিও সব পাব। আমার সব পাওয়া মানে আপনাকে পাওয়া।

মনজু কোনও কথা বলল না।

আলতা বলল, অনেকক্ষণ হল আমি এসেছি।

মনজু একটু চমকাল। তাই তো! একথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম। রাত অনেক হয়েছে। আমাদের এখন ওঠা উচিত।

হ্যাঁ।

মনজু উঠে দাঁড়াল।

আলতাও উঠল। আমি একটা কথা বলতে চাই আপনাকে।

বল।

মানে' আমি আসলে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই।

কী শুনতে চাও?

এই ধরনের অবস্থায় এবং পরিবেশে মেয়েরা চিরকাল ধরে যা শুনতে চায়।

আলতার চোখের দিকে তাকাল মনজু। তাকিয়ে গভীর গলায় বলল, আলতা, আমি তোমাকে ভালবাসি।

সঙ্গে সঙ্গে পাগলের মতো দু'হাতে মনজুর গলা জড়িয়ে ধরল আলতা। মনজুর বুকে মুখ লুকিয়ে গভীর আবেগে ফিসফিস করে বলল, আমিও তোমাকে ভালবাসি। আমিও তোমাকে খুব ভালবাসি। তুমি আমার জান, তুমি আমার আত্মা।

মেয়েকে খুঁজতে খুঁজতে পুকুর ঘাটের দিকে এসেছিলেন রোকেয়া। ঘাটলার কাছাকাছি এসেই আলতার গলা শুনতে পেয়েছিলেন। সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষের গলা। গলাটি মুহূর্তেই চিনেছিলেন তিনি।

এ তো মনজু!
মনজুর সঙ্গে কথা বলার জন্য এভাবে এত রাতে একাকী ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে আলতা! কোনও ভয়, দুর্নাম কিছুই গ্রাহ্য করেনি!

কী কথা মনজুর সঙ্গে!

তারপরই ব্যাপারটা বুঝে গিয়েছিলেন রোকেয়া। এত রাতে এই বয়সী মেয়ে কোন্ আকর্ষণে ঘর ছেড়ে বেরয়। বুঝে যাওয়ার পর বুকের ভেতরটা কাঁপতে শুরু করেছে তাঁর। হাত পা অবশ হয়ে এসেছে। তিনি আর নড়তে চড়তে পারছিলেন না। ঝোপঝাড়ের আড়ালে এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিলেন, যেখানে ঝোপ-ঝাড়ের মাথার ওপর বিশাল এক জামগাছ। জামগাছের ছায়ায় অন্ধকার হয়ে আছে জায়গাটি। তলায় মানুষ দাঁড়িয়ে থাকলে দেখার উপায় নেই।

আলতা কিংবা মনজু কেউ দেখতে পায়নি রোকেয়াকে। রোকেয়া পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন ওদেরকে। পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন ওদের কথা। শুনতে শুনতে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন। নড়তে পারছিলেন না। সময় কেটে যাচ্ছে, রাত গভীর হচ্ছে টের পাচ্ছিলেন না।

যখন আলতা জড়িয়ে ধরল মনজুর গলা, কী যেন কী কারণে মেয়ের ওপর রাগ, ঘৃণা, অভিমান কিংবা অন্য কিছু হল না রোকেয়ার কেবল বুকটা তোলপাড় করে উঠল। চাপা এক কান্নার ভারে বুক ফেটে গেল, চোখ ফেটে গেল রোকেয়ার। অন্ধকার জামতলায় দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন তিনি।

৮

মখমলের মতো সবুজ ঘাসের ওপর পড়েছে রূপোলি জ্যোৎস্না। সেই জ্যোৎস্নায় জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে দু'জন মানুষ। চাঁদের আলো এবং বহতা হাওয়ায় দৃশ্যটি এত পবিত্র মনে হয়! আজকের আগে যেন এত সুন্দর একটি দৃশ্য কখনও তৈরি হয়নি পৃথিবীতে। আজই যেন প্রথম হল।

এক হাতে সহেলীর মাথাটা বুকে চেপে ধরে রেখেছে কিরণ, অন্যহাত গভীর মায়া মমতায় বুলিয়ে দিচ্ছে সহেলীর মাথায়, পিঠে। সহেলী দু'হাতে জড়িয়ে রেখেছে কিরণের গলা। মুখটা শিশুর মতো চেপে রেখেছে কিরণের বুকে।

কিরণ বলল, তোমার ভাল লাগছে সখী?

সহেলী জড়ান গলায় বলল, খুব ভাল লাগছে। তোমার ভাল লাগছে না জান?

হ্যাঁ, আমারও খুব ভাল লাগছে।

সাপের ভয় করছে না তো?

না। তোমাকে বুকে জড়িয়ে মরে গেলেও আমার সুখ।

এই তো তুমি আমার মতো করে অনুভব করতে পারছ। এই তো তুমি আমার মতো হয়ে উঠছ। আমার মতো করে ভালবাসতে পারছ আমাকে।

তোমার মতো করে নয়, আমার মতো করে আমি এখন তোমাকে ভালবাসছি। এতদিন আমাদের দু'জনের ভালবাসা ছিল দুরকম, আজ এই মুহূর্ত থেকে একরকম হয়ে গেছে। আমি যেমন করে ভালবাসি তোমাকে, তুমিও ঠিক তেমন করে ভালবাসছ আমাকে। এ যে আমার কত বড় পাওয়া, কত বড় সুখ– সে তুমি বুঝবে না।

কেন বুঝব না! তোমার মতো করে আমিও তো বলতে পারি।

কি বলতে পার তুমি?

বলতে পারি তোমাকে ভালবেসে, তোমাকে পেয়ে কি যে পেয়েছি আমি, কতটা যে সুখী আমি হয়েছি– সে তুমি বুঝবে না।

কিরণের গলার কাছে মুখটা একটুখানি ঘষে দিয়ে সহেলী বলল, বল, এভাবে আরও বল তুমি। আমি শুনতে চাই, আমি শুধু শুনতে চাই।

কিন্তু আমি তোমাকে এখন অন্য রকম কিছু কথা বলতে চাই। কি রকম? মন খারাপ করা?

ঠিক জানি না। তোমার মন খারাপ হবে কি না বুঝতে পারছি না।

মন খারাপ করা কথা হলে বল না। আমি শুনতে চাই না। এ আমার বড় সুখের সময়, এ আমার বড় আনন্দের সময়। এই সুখ, এই আনন্দ আমার তুমি নষ্ট করে দিও না।

কিন্তু এমনও হতে পারে কথাগুলো শুনে তোমার হয়ত মন খারাপ হবে না, বরং খুশি হবে তুমি। আনন্দ অনেক বেড়ে যাবে তোমার।

তাহলে বল।

এখান থেকে আমি আর ফিরে যেতে চাই না।

কোথায় ফিরে যেতে চাও না?

ঢাকায়।

কথাটা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

তোমাকে নিয়ে ঢাকায় আমি আর ফিরে যেতে চাই না।

তাহলে কোথায় থাকবে?

এখানেই।

এই বাংলোতে?

হ্যাঁ।

কি করে?

যেভাবে থাকছি সেভাবেই।

বাংলোর মালিক তোমাকে থাকতে দেবেন?

দেবেন।

কি করে বুঝলে?

তার সঙ্গে ওভাবেই কথা হয়েছে আমার।

কিভাবে?

আমার যতদিন ইচ্ছে আমি এখানে থাকতে পারব। আর যদি কখনও এই বাংলো ছাড়তে হয়, তাহলে এই এলাকায় এই ধরনের নির্জন কোন একটি বাড়ি ভাড়া নেব কিংবা নিজেদের মতো করে ছোটখাট? একটা বাড়ি তৈরি করে নেব।

ছোটখাট কেন? এ রকম একটা বাংলোই আমরা তৈরি করে নেব।

তা কি করে করব?

কেন?

অনেক টাকা লাগবে যে!

লাগুক। টাকার অভাব আছে নাকি তোমাদের! ইচ্ছে করলে এরকম পাঁচটা বাংলো এখানে করতে পার তুমি।

কিন্তু বাড়ি থেকে আমি কোন টাকা পয়সা নিতে চাই না।

ঠিক আছে তোমার নেয়ার দরকার নেই।

তাহলে?

আমি আমার পাপার কাছ থেকে নেব। চাইলে কালই দশ লাখ টাকা পাপা আমাকে দিয়ে দেবেন।

না তুমিও চাইবে না।

কেন?

আমি আসলে আমার মা বাবা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব পরিচিত সার্কেল কারও সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখতে চাই না।

কেন গো? এত অভিমান করেছ কেন তুমি?

তোমার জন্য।

আমার জন্য?

হ্যাঁ।

আমি কি করেছি?

তুমি কিচ্ছু করনি।

তাহলে?

করেছেন আমাদের গার্জিয়ানরা।

কি করেছেন?

তোমার আমার প্রেমে নানারকমভাবে বাধা দিয়েছেন তাঁরা, বিয়েতে নানারকমের ঝামেলা করেছেন, এই কারণে ভেতরে ভেতরে তাঁদের ওপর আমার খুব রাগ হয়েছে, খুব অভিমান হয়েছে। আমি তাঁদের সঙ্গে আসলে কোন সম্পর্কই আর রাখতে চাই না।

বল কি!

সত্যি।

আশ্চর্য ব্যাপার। ভেতরে ভেতরে এত অভিমান হয়েছে তোমার আর আমি তা টের পাইনি! কেন পাইনি গো! তুমি আমাকে আগে বলনি কেন?

এই যে এখন বলছি।

তুমি কি আগেই ভেবে রেখেছিলে এখানে এসে এসব আমাকে বলবে?

হ্যাঁ।

তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে?

আমার মনে হয় তোমারও তোমার বাবা মার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে না।

কেন?

ওই একই কারণে, যে কারণে আমি আমার বাবা মা আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে বাদ দিচ্ছি। তোমাকে ভালবাসার কারণে আমার বাবা মা আমার সঙ্গে যেমন ববহার করেছে, আমাকে ভালবাসার কারণে তোমার বাবা মাও নিশ্চয় তেমন ব্যবহার তোমার সঙ্গে করেছেন?

তা তো করেছেনই।

তাহলে?

তাহলে কি গো?

আমার যেমন আমার মা বাবার ওপর অভিমান তোমারও তেমন অভিমান হওয়া উচিত।

অভিমান এক সময় ছিল। এখন নেই।

কেন?

তোমাকে আমি চেয়েছি, তোমাকে আমি পেয়েছি। এখন আর কারও ওপর কোন অভিমান নেই আমার । আমি সবাইকে মাফ করে দিয়েছি।

কিন্তু ওই মানুষগুলোর কাছে ফিরে গেলে নানা রকমভাবে তারা সারাজীবন ধরে আমাদের জ্বালাবেন। তাঁদের জ্বালাতনে আমাদের ভালবাসা নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

এ কথা শুনে আঁতকে উঠল সহেলী, না না। না। ভালবাসা নষ্ট হলে আমি মরে যাব। তোমাকে একদিন না দেখলে আমি

মরে যাব। তারচে, এই ভাল। ঢাকায় আমরা আর কখনও ফিরে যাব না। দু'জনের কেউ কারও বাড়িতে ফিরে যাব.না। এই নির্জনে দু'জন দু'জনকে ভালবেসে কাটিয়ে দেব সারাজীবন।

তোমার কষ্ট হবে না?

কিসের কষ্ট?

আমার জন্য সবাইকে ছেড়ে থাকা!

দু'হাতে শক্ত করে কিরণের গলা জড়িয়ে ধরল সহেলী। মা বাবা আত্মীয়স্বজন, এমন কি পুরো পৃথিবী একদিকে আর একদিকে তোমাকে দিয়ে আমাকে যদি কেউ বলে আমি কোন দিকটা নেব, আমি চোখ বুজে তোমার হাত ধরব। বলব, আমি এই দিকটা নিলাম। আমি আমার ভালবাসা নিলাম।

আমিও তাই।

কিরণ তারপর উৎফুল্ল গলায় বলল, তাহলে আমরা ফিরে যাব না।

সহেলী বলল, আচ্ছা।

তারপর একটু থেমে বলল, কিন্তু এখানে আমাদের চলবে কি করে?

আমি কোন একটা স্কুলে টিচারি করব।

খুব ভাল হবে তাহলে! তুমি স্কুল করে ফিরবে, আমি তোমার খাবার নিয়ে বসে থাকব।

আচ্ছা।

আর যে রাতে চাঁদ উঠবে এইভাবে বাগানে এসে শুয়ে থাকব আমরা।

আচ্ছা।

প্রতিদিন তুমি আমাকে আজকের মতো ভালবাসবে।

বাসব। আমি তোমাকে এরচেয়েও বেশি ভালবাসব।

যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন গলায় সহেলী বলল, কিন্তু ড্রাইভার যে আমাদের ফিরিয়ে নিতে আসবে!

কিরণ একটু চিন্তিত হল। তাই তো?

তাহলে চল একটা কাজ করি।

কি কাজ?

এখান থেকে চলে যাই আমরা।

কোথায়?

এরচেয়েও নির্জন কোন জায়গায়। যেখানে কেউ আমাদের খুঁজে পাবে না, কেউ আমাদের চিনবে না। ওখানে গিয়ে কোন স্কুলে চাকরি নেবে তুমি।

কিরণ গভীর গলায় বলল, দরকার হলে তাই করব। তোমাকে নিয়ে এমন জায়গায় চলে যাব আমি

যেখানে আমাদেরকে কেউ চিনবে না। সারাজীবন তোমাকে বুকে নিয়ে সেই অচেনা জায়গায় থেকে যাব আমি। আমরা কেউ কখনও কোথাও ফিরে যাব না।

তাহলে চল দু একদিনের মধ্যেই সেই জায়গায় চলে যাই। ড্রাইভার এসে যেন আমাদেরকে না পায়।

আচ্ছা।

প্রমিজ?

গভীর ভালবাসায় সহেলীকে বুকে জড়িয়ে কিরণ বলল, প্রমিজ।

আসলে ভেতরে ভেতরে সহেলীকে নিয়ে তখন স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে কিরণ। সহেলীকে সে এখানে, নিজের কাছে রেখে দেবে। দরকার নেই তার সহেলীদের ঢাকার ঠিকানা জানার। সহেলীকে সে ভালবাসে। হোক সহেলী পাগল। সহেলীও তো ভালবাসে কিরণকে। এই ভালবাসার জোরেই সহেলীকে সে নিজের কাছে চিরকাল ধরে রাখবে। এখানে যদি কোন সমস্যা হয় সহেলীকে নিয়ে তাহলে অন্য কোথাও চলে যাবে সে। টাকা পয়সা যা সামান্য জমেছে– ওই নিয়ে দূরে কোথাও গিয়ে ঘর বাঁধবে সহেলীকে নিয়ে। সহেলী তার, একান্তই তার।

কিন্তু সহেলী যে একটি অস্বাভাবিক মেয়ে, এই অস্বাভাবিকতা যে এক সময় কেটে যেতে পারে তার,ঘোরতর বাস্তবে যে এক সময় ফিরতে পারে সে একথা একবারও মনে হল না কিরণের। এই ব্যাপারটি যেন ভুলেই গেছে কিরণ।

সহেলী বলল, তুমি এমন চুপ করে আছে কেন গো?

কিরণ বলল, কি বলব?

বল, একটা কিছু বল।

কি?

ভালবাসার কথা বল।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসল কিরণ।

সহেলী বলল, কি হল?

কিছু না

উঠলে কেন?

আমি বসি, তুমি আমার কোলে মাথা দিয়ে শোও।

আচ্ছা

দুটো পা গুটিয়ে সুন্দর ভঙ্গিতে কিরণের কোলে শুয়ে পড়ল সহেলী। শুয়ে কিরণের মুখে দিকে তাকিয়ে রইল। কিরণও তাকাল সহেলীর দিকে। তাকিয়ে সুন্দর উচ্চারণে বলতে লাগল,

'বুকের মধ্যে সুগন্ধি রুমাল রেখে বরুণা বলেছিলো,
যেদিন আমায় সত্যিকারের ভালবাসবে
সেদিন আমার বুকেও এ রকম আতরের গন্ধ হবে!
ভালোবাসার জন্য আমি হাতের মুঠোয় প্রাণ নিয়েছি
দূরন্ত ষাঢ়ের চোখে বেঁধেছি লাল কাপড়
বিশ্বসংসার তন্ন তন্ন করে খুঁজে এনেছি ১০৮টা নীলপদ্ম
তবু কথা রাখেনি বরুণা, এখন তার বুকে শুধুই মাংসের গন্ধ এখনো সে যে কোনো নারী!
কেউ কথা রাখেনি, তেত্রিশ বছর কাটলো, কেউ কথা রাখে না।'

কবিতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দু'হাতে কিরণের মুখটা নিজের মুখের কাছে নামিয়ে আনল

সহেলী। ফিসফিস করে বলল, আমি রাখব। আমি আমার সব কথা রাখব।

রাত তখন অনেকটাই গভীর হয়েছে। চাঁদ হেলে গেছে পশ্চিমে । নিশিথবেলার হু হু হাওয়ায় নাচছিল। গাছের পাতা এবং ঘাসের ডগা। হাওয়ায় ছিল ফুলের সুবাস। সেই সুবাসে মুগ্ধ হয়ে ছিল মৌন প্রকৃতি। কোথাও ডাকে না একটিও রাতপোকা, কোথাও ডাকে না একটিও রাতপাখি।

এখন যেন সহেলী কোন অস্বাভাবিক মানুষ নয়।

এখন যেন সহেলী পাগল নয়।

এখন সহেলী একেবারে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ।

এখন যেন কিরণ এক পাগল। বদ্ধ উন্মাদ। আশ্চর্য এক ঘোরের মধ্যে আছে সে। ভোরবেলা ঘুম ভাঙার পর থেকেই কি রকম ছটফট করছে কিরণ। দ্রুত হাতে চা নাশতা বানিয়ে অতি যত্নে মুখে তুলে তুলে খাইয়ে দিয়েছে সহেলীকে। সহেলী যে শাড়ি ব্লাউজ পরে এসেছিল, গতকাল বাথরুমে ঢুকে গরম জলে শরীর মোছার সময় সেই শাড়ি ব্লাউজ বাথরুমেই ফেলে এসেছিল সে। সকালে সেই শাড়ি ব্লাউজ সাবান দিয়ে কেঁচে পেছন দিককার বারান্দায় মেলে দিয়েছে কিরণ। দেখে সহেলী ভুরু কুঁচকেছে। এগুলো এত কষ্ট করে ধোয়ার কি দরকার?

কিরণ বলেছে, তাহলে কি করব?

ফেলে দাও।

না।

কেন? এই জিনিস আমি আর কখনও পরব?

না পর।

তাহলে?

তুমি তো এক সময় পরেছ।

তা পরেছি।

এজন্যই ফেলব না। তোমার ব্যবহার করা কোন জিনিস আমি কখনও ফেলব না। সারাজীবন যত্নে রেখে দেব।

সহেলী হেসেছে। তুমি একটা পাগল।

প্রেমিকরা পাগলই হয়।

আর প্রেমিকারা?

তারাও পাগল।

যাহ!

সত্যি। আসলে পাগলরাই হচ্ছে সত্যিকার মানুষ। মনের ভেতর তাদের কোন ঘোরপ্যাঁচ থাকে না। কেবল পাগলরাই কোন কিছু না ভেবে জীবন দিয়ে কাউকে ভালবাসতে পারে। কবি রফিক আজাদ এজন্যই লিখেছেন, 'ভালবাসা মানে দুজনের পাগলামী।'

সত্যি তাই। আমরা কালরাতে যা করেছি তা পাগলামী ছাড়া আর কি!

এসব পাগলামীই আসলে ভালবাসা।

তাহলে আমি চিরকাল পাগল থাকতে চাই।

আমিও।

একটা গান শুনেছ তুমি?

কি গান?

পাগলার মন নাচাইয়া পাগলি গেল চলিয়া, পাগলার মন ঘরে থাকে না।

শুনেছি।
শুনতে হাস্যকর মনে হলেও কিন্তু গানটার অর্থ খুব সুন্দর।
হ্যাঁ, এখানেও ভালবাসার কথাই বলা হয়েছে। গানের ওই পাগলীর মতো তুমি আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না তো?
যদি প্রশ্নটা আমি করি?
আমি উত্তর দেব না।
দাও।
কখনও ছেড়ে যাব না, কোনদিনও ছেড়ে যাব না।
আমিও তাই। তুমি হচ্ছো আমার জান। কোন মানুষ কি তার জান ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে?
দু'হাত সহেলীর দুই কাঁধে রাখল কিরণ। সহেলীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি সখী। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।
এই প্রথম কিরণের এরকম কথার পিঠে কোন কথা বলল না সখী। আশ্চর্য এক চোখ করে কিরণের দিকে তাকিয়ে রইল।
কিরণও সহেলীর মতো করেই তাকিয়ে রইল। তবে মনের ভেতর তখন তার অন্য রকমের কিছু চিন্তা খেলা করছে। কাউকে দিয়ে দরখাস্ত পাঠাবার দরকার নেই স্কুলে, সে নিজেই আজ স্কুলে যাবে। কোন ক্লাশটাস নেবে না। হেড মাস্টারের রুমে বসে এক মাসের ছুটির একটা দরখাস্ত লিখে ছুটি নিয়ে আসবে। ছুটি পেতে কোন অসুবিধা হবে না, কারণ ছুটি পাওনা আছে তার। অবশ্য এতদিনের ছুটি নিচ্ছে দেখে অন্যান্য শিক্ষকরা নানা রকমের প্রশ্ন করবে। কিরণ তাদের বলবে সে কিছুদিনের জন্য ঢাকায় যেতে পারে। কাজ আছে। অথবা বলবে তার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। এক মাস রেষ্ট নেবে। স্কুল থেকে ফেরার সময় চাপাতা দুধ চিনি রুটি বিস্কুট এসব কিনে আনবে। কিন্তু সহেলী তাকে যেতে দেবে তো?
ছাড়তে রাজি হবে তো?
তারপরই আরেকটা কথা মনে হল কিরণের! এভাবে কতদিন সহেলীকে নিজের কাছে রাখবে সে? তাদের ভেতরকার সম্পর্কটা তো কেউ বুঝবে না। সামাজিকভাবে তো ব্যাপারটা অবৈধ হয়ে যাবে! তাছাড়া সহেলী আছে হানিমুনের ঘোরে। কিরণ একজন জলজ্যান্ত বয়স্ক পুরুষ। কতক্ষণ নিজেকে ধরে রাখবে সে!
ঠিক আছে ওসব নিয়ে পরে ঠান্ডা মাথায় ভাবা যাবে। আপাতত ছুটি এবং প্রয়োজনীয় খাবার টাবার জোগাড় হোক।
কিরণ খুবই সরল গলায় বলল, ঘন্টা তিনেকের জন্য আমাকে যে একটু ছাড়তে হবে সখী।
সহেলী অবাক হয়ে কিরণের মুখের দিকে তাকাল। মানে?
আমি এবার বাইরে যাব।
এ কথায় সহেলী একেবারে আঁতকে উঠল। কোথায়?
বাজারে।
কেন?
ঘরে খাবার টাবার কিছু নেই। কিনে আনতে হবে।
না দরকার নেই।
তাহলে খাবে কি?
না খেয়ে থাবব। তুমি যেতে পারবে না।

পাগল মেয়ে! না খেয়ে থাকতে পারবে?

পারব।

সে এক দুদিন। তারপর খিদেয় পাগল হয়ে যাবে।

না কিছু হবে না।

শোন, এমন করো না। একটু বোঝার চেষ্টা কর। মাত্র দুতিন ঘন্টা। খাবার টাবার সব এনে রাখলে একমাস আর না বেরুলেও চলবে।

ঠিক আছে যাও। তবে একা যেতে পারবে না।

তাহলে?

আমাকেও সঙ্গে নিতে হবে।

বল কি!

হ্যাঁ।

কিন্তু বাজার তো অনেক দূর!

কত দূর?

দু আড়াই মাইল।

হোক

যেতে হবে হেঁটে!

যাব।

শোন, মাত্র জ্বর থেকে উঠলে তুমি। এখন যে রকম রোদ ওঠে, এই রোদে আধমাইলও হাঁটতে পারবে না তুমি। অসুস্থ হয়ে যাবে। তুমি আবার অসুস্থ হলে আমার খুব মন খারাপ হবে।

কিন্তু তোমাকে ছেড়ে দুতিন ঘন্টা আমি থাকব কি করে?

ঘুমোবে।

আমার ঘুম হবে না।

কেন?

তুমি কাছে না থাকলে ঘুম হয় না আমার।

কিরণ হাসল। বিয়ের আগে তাহলে তুমি ঘুমিয়েছ কি করে?

তখন আর এখন কি এক হল! বিয়ের আগে তোমার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়তাম। আর এখন তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে পড়ি।

দু'তিন ঘন্টা তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমারও অবশ্য খুব কষ্ট হবে।

তাহলে যাওয়ার দরকার কি!

না গেলে কি করে হবে! আজ যদি না যাই কাল তো যেতেই হবে। কাজটা যখন সারতেই হবে আগেভাগেই সেরে রাখি। একবারে মাসখানেকের বাজার করে আনব যাতে একমাস আর না বেরুতে হয়।

সবই বুঝলাম কিন্তু আমার ভাল লাগবে না।

এইটুকু কষ্ট তুমি কর।

সহেলী কথা বলে না। মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থাকে।

দু'হাতে কিরণ তাকে বুকের কাছে টেনে আনল। তুমি মন খারাপ করো না সখী। মাত্র তো দু'তিন ঘন্টার ব্যাপার।

সহেলী আগের মতোই মুখ ভার করে বলল, যেতে দিতে পারি তবে একটা শর্ত আছে।

কি শর্ত?
আমাকে অনেকক্ষণ আদর দিয়ে যেতে হবে।
আচ্ছা।
এক হাতে সহেলীকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে অন্যহাত তার মাথায় পিঠে বুলিয়ে দিতে লাগল কিরণ।
সহেলী বলল, এইভাবে না।
তাহলে?
জানি না। এমা, কি বোকা ছেলে! বউকে কেমন করে আদর করতে হয় তাও জানে না।
সঙ্গে সঙ্গে সহেলীর ঘাড়ের কাছে মুখ নামাল কিরণ। সহেলীর ঘাড়ে গলায় পিঠেমুখ ঘষতে ঘষতে বলল, আমাকে তুমি লোভী করো না। আমাকে তুমি সংযত থাকতে দাও। এখনও সময় হয়নি। সময় হলে আদরে আদরে আমি তোমাকে ভরিয়ে দেব। তারপরই সহেলীকে ছেড়ে দিল কিরণ।
আমি তাহলে যাই সখী!
সহেলী বলল, যাই নয়, বল আসি।
আচ্ছা। আসি তাহলে।
এস জান।
কিরণ দরজার দিকে পা বাড়িয়েছে। সহেলী বলল, শোন।
কিরণ ঘুরে দাঁড়াল। বল।
কাছে এস।
সহেলীর সামনে এসে দাঁড়াল কিরণ।
দু'হাতে কিরণের দু'গাল ধরল সহেলী! তারপর কিরণের মাথাটা নামিয়ে এনে কপালে দু'চোখের পাতায় এবং দু'গালে চুমু খেল। এবার এস।
কিরণ হতবাক হয়ে সহেলীর দিকে খানিক তাকিয়ে রইল। তারপর বেরিয়ে গেল।
আলতা শুয়ে শুয়ে পড়ছে রোকেয়া এসে তার সামনে দাঁড়ালেন। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।
কী কথা মা?
মজনুর সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?

৯

রোকেয়া কখন এসে এই ঘরে ঢুকেছেন টের পায়নি আলতা।
সে মগ্ন হয়ে বই পড়ছিল। আশ্চর্য রকমের রোমান্টিক এক বই। শুরু করলে শেষ না করে ওঠা যায় না। পড়ার সময় অন্য কোনও দিকে খেয়াল থাকে না।
এমন কি খিদেও পায় না।
ঘুমও পায় না।
তার ওপর বইটি যে পড়ছে সে নিজে যদি থাকে একটি প্রেমের আবহের মধ্যে। সে নিজে যদি ডুবে থাকে কারও গভীর প্রেমে!
আলতার অবস্থা তো তাই।
সে তো আছে প্রেমের আবহের মধ্যেই।
সে তো গভীর ভাবে ডুবে আছে কারও প্রেমে!

সুতরাং এই ধরনের বই পড়ার সময় সে কী করে টের পাবে তার ঘরে এসে কে ঢুকেছে!

আলতার ঘরে ঢুকে তাকে খানিক বই পড়তে দেখলেন রোকেয়া। তারপর ওই প্রশ্নটি করলেন। মনজুর সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক? কথাটা বুঝতে পারল না আলতা।

মায়ের গলার শব্দে তাঁর দিকে তাকাল। মিষ্টি করে হেসে বলল, তুমি এই ঘরে কখন এলে মা?

রোকেয়া আগের মতোই গম্ভীর গলায় বললেন, কথা ঘোরাবার চেষ্টা করিস না।

আলতা অবাক হল। কথা ঘোরাবার চেষ্টা মানে?

আমি যা জানতে চাইছি তার জবাব দে।

কী জানতে চাইছ তুমি?

তুই শুনিসনি?

না।

আমার চালাকি করিস না আলতা।

বইটির সঙ্গে যে পৃষ্ঠা অব্দি পড়া হয়েছে সেই পৃষ্ঠার ওপরের দিককার কোণা ভেঙে ভাঁজ করল আলতা তারপর উঠে বসল। তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না মা। কী চালাকি তোমার সঙ্গে আমি করেছি বল তো!

রোকেয়া আগের মতোই গম্ভীর গলায় বললেন, এই যে আমার কথা শুনেও না শোনার ভান করছিস।

আমি সত্যি তোমার কথা শুনতে পাইনি।

কেন পাসনি?

আমি বই পড়ছিলাম।

বই পড়লে কি এত কাছ থেকে বলা কথা মানুষ শুনতে পায় না?

হয়ত পায়।

তাহলে?

আমি পাইনি।

যদি আমার কথা তুই শুনতে না পেয়ে থাকিস তাহলে আমার দিকে তুই তাকালি কেন?

তুমি কিছু একটা বলেছ তা বুঝেছি কিন্তু কী বলেছ বুঝতে পারিনি।

আমার মনে হয় বুঝতে তুই পেরেছিস। বুঝেও না বোঝার ভান করছিস।

না।

হ্যাঁ।

হাত বাড়িয়ে রোকেয়ার একটা হাত ধরল আলতা। মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কী হয়েছে মা? তুমি আমার সঙ্গে এমন করছ কেন?

ঝটকা মেরে হাতটা ছাড়িয়ে নিলেন রোকেয়া। আগের মতোই রাগি গম্ভীর গলায় বললেন, ঠিক আছে ,যখন শুনতে পাসনি আমি আবার বলছি। মনজুর সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক?

একথা শুনে কেঁপে উঠল আলতা। চমকে উঠল। অপলক চোখে মায়ের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে রইল সে। তারপর মাথা নিচু করল।

রোকেয়া বললেন, কী হল? কথার জবাব দিচ্ছিস না কেন?

আলতা কথা বলল না।

আলতা নতমুখ তুলল না।

রোকেয়া বললেন, কী ব্যাপার, কথা বলছিস না যে?

এবার চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল আলতা। হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্ন আমাকে তুমি করছ কেন?

করার নিশ্চয় কারণ আছে।

কী কারণ?

সব কি তোকে আমার খুলে বলতে হবে?

হ্যাঁ।

কেন?

না বললে আমি বুঝব কী করে?

আসলে কি আর কিছু বোঝার দরকার আছে তোর?

আলতা কথা বলল না, তার ঘরের উঁচু পালঙ্কের বুকের কাছে একটা জানালা। জানালাটা এখন খোলা। সেই খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

বাইরে এখন বিকেল হয়ে আসা রোদ ঝিমঝিম করছে। গাছপালার বনে খেলা করছে মৃদু মোলায়েম হাওয়া। হাওয়ায় গাছপালার বনেলা গন্ধ। কী একটা পাখি থেকে থেকে ডাকে। কেমন যেন এক একাকীত্ব পাখির ডাকে। কী যেন এক দুঃখ বেদনার সুর। রোকেয়া বললেন, অনেক কিছু দেখে, শুনে এবং বুঝে প্রশ্নটা তোকে আমি করেছি। সে রাতে আমি তোকে খুঁজতে খুঁজতে পুকুরঘাটে গিয়েছিলাম।

আলতা চট করে মায়ের দিকে মুখ ফেরাল। কী বলছ মা?

ঠিকই বলছি। আমি তোকে মনজুর হাত ধরতে দেখেছি। আমি তোদের সব কথা শুনেছি।

এবার আলতা গম্ভীর হল। সব কথা যদি শুনেই থাক তাহলে আবার প্রশ্ন করছ কেন?

তা অবশ্য ঠিক। প্রশ্ন না করলেও হত। করলাম কথা তোলার জন্য। বিষয়টি নিয়ে তোর সঙ্গে আমার কথা বলা দরকার।

বল কী বলতে চাও।

তুই নিশ্চয়ই বুঝেছিস আমি অন্য দশটি মায়ের মতো নই। তেমন হলে ওই রাতে তোর বাবাকেও পুকুরঘাটে ডেকে নিতাম। একটা কোনও কেলেংকারি করতাম। কিংবা আমি নিজেই তোর এবং মনজুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। তোদেরকে গালাগাল করতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। আমার খুব কান্না পাচ্ছিল, ওখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছিলাম আমি।

কেন?

বললে কি তুই সে কথার অর্থ বুঝবি?

কেন বুঝব না! আমি কি দুধের শিশু?

পালঙ্কের কোণে বসলেন রোকেয়া। আমার তো মনে হয় তুই আসলেই দুধের শিশু। মা বাবার কাছে ছেলেমেয়েরা কখনও তেমন বড় হয় না। শিশুই থাকে তারা।

একটু থামলেন রোকেয়া। তারপর বললেন, সে রাতের কথা আমি ছাড়া কেউ জানে না।

বাবাকে জানাওনি তুমি?

না।

কেন?

জানালে কেলেংকারি হবে।

কী কেলেংকারি হবে?

তোর বাবাকে তুই চিনিস না?

তা তো চিনিই।

তাহলে আবার প্রশ্ন করছিস কেন?

আলতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন যে করছি. জানি না।

কিন্তু এ তুই কী করেছিস? কী হবে এখন?

তুমি যখন সব জেনেছ, বুঝেছ তাহলে তো তোমারই জানার কথা কী হবে এখন। কী করা উচিত তোমাদের?

কী করা উচিত বল।

মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার গলায় আলতা বলল, মনজু ভাইর সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে দাও।

তা কী করে সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়?

আরেক জায়গায় যে তোর বিয়ে কথা পাকা হয়েছে।

পাকা হয়েছে মানে?

না মানে তোকে দেখে টেখে গেল।

তা তে কী হয়েছে ! সেখানে তোমরা জানিয়ে দাও ওই পাত্রের সঙ্গে তোমরা তোমাদের মেয়ের বিয়ে দেবে না।

কিন্তু তোর বাবার তো ওই ছেলে খুব পছন্দ।

বাবাকে তুমি বোঝাও।

কী বোঝাব?

মানে মনজু ভাইর কথা বাবাকে তুমি বল।

তোর বাবা রাজি হবেন না।

কেন?

মনজু একটা বেকার ছেলে। পারিবারিক অবস্থা ভাল না। আমাদের অবস্থা তো ভাল!

মানে?

আমি তোমাদের একমাত্র মেয়ে। আমার বরকে তোমরা তোমাদের উপযুক্ত করে নেবে।

এ কি সম্ভব?

কেন সম্ভব নয়। এরকম কি হয় না?

হয়।

তাহলে ?

রোকেয়া কথা বললেন না।

আলতা বলল, মনজু ভাল ফ্যামিলির ছেলে। শিক্ষিত ছেলে, দেখতে ভাল। তার উপর আমার সঙ্গে তার..... ।

কথাটা শেষ করল না আলতা। জানালার দিকে তাকিয়ে রইল।

রোকেয়া বললেন, ব্যাপারটা কত দিনের?

আলতা মায়ের দিকে তাকাল। কোন ব্যাপারটা?

মনজুর সঙ্গে তোর সম্পর্ক?

অনেকদিনের।
অনেকদিন মানে?
আমি যখন থেকে নিজেকে বুঝেছি। মেয়েদের জীবন, বিয়ে ইত্যাদি যখন থেকে বুঝতে শিখেছি তখন থেকেই মনজুর কথা আমি ভেবেছি। সে ছাড়া অন্য কেউ আমার বর হবে, অন্য কারও সঙ্গে আমার বিয়ে হবে এ আমি কখনও ভাবিনি।
আমাকে তাহলে জানাসনি কেন?
মানে?
এই যে আমরা তোর জন্য ছেলেটেলে দেখছি, ব্যাপারটা জানা থাকলে এসবের দরকার হত না।
তোমাকে জানানোর একটা অসুবিধা আমার ছিল।
কী অসুবিধা?
আমি আমার কথাটা জানতাম, মানে আমি যে মনজুকে পছন্দ করি এটা তো আমি জানি কিন্তু মনজু আমাকে পছন্দ করে কী না, আমাকে নিয়ে ভাবে কী না তা আমি জানতাম না।
বলিস কী!
হ্যাঁ।
তার মানে ওই রাতে তুই তা জেনেসি?
হ্যাঁ।
রোকেয়া একটু চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, কিন্তু তারপরও তো অনেকগুলো দিন কেটে গেছে, তুই তো আমাকে কিছুই বলিসনি।
হ্যাঁ বলিনি।
কেন?
খুবই অন্য রকম একটা কারণ আছে।
কী রকম?
মনজুর কথা জানার পর থেকে আমি কেমন যেন একটা ঘোরের মধ্যে আছি। আমার শুধু মনে হয়, যখনই ওর কথা আমি অন্য কাউকে বলব তখনই আমার এই আশ্চর্য ঘোর কেটে যাবে। ওকে নিয়ে আমার মনের ভেতর যে গভীর আনন্দ তখন এই আনন্দটা নষ্ট হয়ে যাবে। কঠিন বাস্তব আমার ভাল লাগার আবেগটা নষ্ট করে দেবে।
অদ্ভুত এক চোখ করে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন রোকেয়া। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।
আলতা বলল, তুমি কি আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছ মা? রোকেয়া বললেন, বুঝেছি। কিন্তু এটা বোঝা আমার উচিত নয়।
কেন?
আমি তোর মা। আমি আমাদের পারিবারিক অবস্থাটা বুঝতে চাইব। তুই যে কারণে আমাকে ব্যাপারটা জানাতে চাসনি এ তোর একান্ত ব্যক্তিগত এক অনুভূতি, কিন্তু মা হিসেবে আমি ভাবব, যদি ওই পাত্রের সঙ্গে এই ফাঁকে তোর বাবা তোর বিয়ের কথা পাকাপাকি করে ফেলেন আর তখন আমরা জানতে পারি মনজুর কথা, তাহলে পাত্রপক্ষের কাছে মুখ থাকবে না আমাদের। আমরা খুব ছোট হয়ে যাব। আমাদের সম্মান নষ্ট হবে।
এটা আমি বুঝি।
তাহলে?

আলতা কথা বলল না।
রোকেয়া বললেন, কথা বলছিস না কেন?
কী বলব!
তাই তো কী আর বলবি তুই ! সবই তো বলে দিয়েছিস।
কিন্তু এভাবে মায়েদের কাছে মেয়েরা কখনও বলে না। আমিও বলতাম না -যদি তুমি আমার মা না হতে।
কেন আমি কী করেছি?
আমি জানি, আমার প্রতিটি অনুভূতি তুমি নিজের মতো করে অনুভব করবে।
করে কী লাভ?
মানে?
আমি কেমন করে এটা সামলাব?
সামলাতে তোমাকেই হবেই।
তোর বাবাকে তুই জানিস না?
জানব না কেন? খুব একরোখা মানুষ! একবার কিছু একটা ডিসাইড করলে সেটা না করে ছাড়েন না।
তাহলে?
বাবা কিছু ডিসাইড করার আগেই তুমি তাকে ব্যাপারটা জানাও।
রোকেয়া কথা বললেন না। আনমনা হয়ে কী ভাবতে লাগলেন। আলতা বলল, তোমাকে দু একটা কথা জিজ্ঞেস করব মা?
কর।
মনজুকে তোমার পছন্দ হয়?
হয়। মনজু ভাল ছেলে।
তাহলে বাবাকে তুমি রাজি করাও।
আমি চেষ্টা করব। কিন্তু যদি এমন হয় যে তোর বাবা রাজি হলেন না।
তুমি বললে না হয়ে পারবেন না।
আমি যদির কথা বলছি না। যদি না হন? কী করবি তখন?
জানি না।
কিন্তু জানতে তো হবে। কী করবি তখন বল আমাকে।
আলতার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। দু'হাতে মায়ের একটা হাত আকড়ে ধরল সে। ভাঙাচোরা গলায় বলল, আমি জানি না। আমি কিছু জানি না মা। মনজু ছাড়া অন্য কারও সঙ্গে বিয়ে হলে সংসার করা আমার হবে না। আমি বাঁচব না।
সন্তানের মৃত্যুর কথা ভাবতে পারেন কোন মা!
তার ওপর যে মায়ের সন্তান মাত্র একটিই!
মেয়ের মৃত্যুর কথা শুনে রোকেয়া কেমন দিশেহারা হয়ে গেলেন। সেই যে ছেলেবেলায় মেঘবৃষ্টির দিনে দশদিক কাঁগিয়ে বাজ পড়লে ভয়ার্ত ছোট্ট মেয়েটি তার যেভাবে বুকে মুখ লুকাত, তখন যেভাবে দু'হাতে মেয়েটিকে তিনি জড়িয়ে ধরে পৃথিবীর যাবতীয় ভয়-ভীতি এবং দুঃখ-বেদনা থেকে আড়াল করার চেষ্টা করতেন এখনও যেন তাই করলেন। দু'হাতে মেয়ের মাথাটি চেপে ধরলেন বুকে।

মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে কেন যে আলতা তখন হু হু করে কাঁদছে।

১০

দিঘীরপার বাগরের রতন ঠাকুর নামের হিন্দু যুবকটির দোকানের চায়ের কোনও তুলনা হয় না। অসাধারণ চা করে রতন। যেমন রঙ হয় চায়ের তেমন গন্ধ, তেমন স্বাদ। এক কাপ খেলে দিনভর স্বাদটা লেগে থাকে জিভে। ফলে ভিড়টা রতনের দোকানে লেগেই আছে। চাখোড় লোকের ভিড়। দোকানের ভেতর একটা করে টেবিল ঘিরে চারখানা করে চেয়ার। এমন টেবিল ছখানা। অর্থাৎ চব্বিশজন খদ্দের বসার ব্যবস্থা। বাগর চলার সময় তবু ঠাঁই থাকে না দোকানে। বসার জায়গা থাকে না। লোকে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই হুস হাস শব্দে চা খেয়ে যায়।

তালুকদার সাহেবও দুচারদিন খেয়েছেন। বাগরে এলে রতনের দোকানের চা না খেয়ে বাড়ি ফেরেন না তিনি।

আজও ফিরতে চাইলেন না। বাগরের কাজ শেষ করে রতনের দোকানের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে ভেতর পানে তাকিয়ে একটু অবাকই হলেন। একখানা টেবিল বেশ ফাঁকা। মাত্র একজন লোক বসে চা খাচ্ছে এবং সেই লোকটি মেছের ঘটক।

বেশ কয়েকদিন ধরেই মেছের ঘটককে খুঁজছেন তালুকদার সাহেব। পয়সার ছেলেপক্ষ সেই যে দেখে গেল আলতাকে আর কোনও খবর দিল না! মেয়ে পছন্দ হল কি হল না জানাবে না! পছন্দ হলে তারপর তো অন্য কথা! দেয়াথোয়া কি হবে, বিয়ের দিন তারিখ কবে! নিজের অজান্তেই তারপর রতন ঠাকুরের দোকানে ঢুকলেন তালুকদার সাহেব। মেছের ঘটকের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালেন। খবর কী ঘটক? ভাল?

মুগ্ধ চিত্তে খুবই আয়েশ করে চাটা খাচ্ছিল মেছের ঘটক। কোনও দিকে খেয়াল ছিল না তার। তালুকদার সাহেবের কথা শুনে খুবই তুচ্ছ তাচ্ছিলের ভঙ্গিতে চোখ তুলে তাকাল। যেন চা খাওয়ার সময় কাউকেই পাত্তা দেয় না সে।

কিন্তু তালুকদার সাহেবকে সামনে দাঁড়ান দেখে এই ভাবটা মেছেরের থাকল না। চা ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল সে। স্লামালেকুম তালুকদার সাহেব। আরে আপনি এলেন কখন! দেখতেই পেলাম না!

তালুকদার সাহেব হাসলেন। কী করে পাবে! তুমি তো চা খাচ্ছিলে!

জ্বী জ্বী চা খাচ্ছিলাম। রতনার চাটা এত ভাল, খাওয়ার সময় কোন দিকে খেয়াল থাকে না!

তা ঠিক !

আপনি কি চা খেতে এলেন?

তাছাড়া আর কী!

বসেন তাহলে, বসেন।

তালুকদার সাহেব বসতে বসতে বললেন, তোমাকে দেখে চা খাওয়ার উৎসাহটা আরও বেড়ে গেল। মেছের ঘটক হাসিমুখে বলল। তাই নাকি!

হ্যাঁ।

তাহলে তো আপনার সঙ্গে বসে আরেক কাপ চা খেতে হয়।

খাও।

রতনের দিকে তাকিয়ে দুটো আঙুল তুলল মেছের ঘটক। মুহূর্তে দুকাপ চা এল। ঘটকের আগের কাপে সামান্য চা ছিল।

এক চুমুকে সেই চা শেষ করল ঘটক। তারপর নতুন কাপ টেনে নিল। আজ আমি আপনার বাড়ি যেতাম তালুকদার সাহেব।

তালুকদার সাহেব নিজের কাপে চুমুক দিলেন। তাই নাকি!

জ্বী!

কোনও খবর আছে?

আছে।

কেমন খবর?

ঘটক ভুরু নাচাল। কেমন খবর আশা করেন আপনি?

খবর তো লোকে ভালই আশা করে।

আপনার আশা পূরণ হবে।

মানে?

সেকথা বলতেই তো আপনার বাড়ি যাচ্ছিলাম।

আমিও অবশ্য মনে মনে তোমাকে খুঁজছিলাম।

আমার সৌভাগ্য।

চায়ে আরেক চুমুক দিয়ে তালুকদার সাহেব বললেন, এবার খবরটা বল।

মেছের ঘটক হাসি মুখে বলল, মা জননীকে ওদের খুব পছন্দ হয়েছে।

কথাটা শুনে তালুকদার সাহেবের বুকের ভেতর আনন্দের একখানা হুলস্থুল পড়ে গেল, কিন্তু ব্যাপারটা তিনি মেছের ঘটককে বুঝতে দিলেন না। নির্বিকার গলায় বললেন, তাই নাকি?

জ্বী।

কী বলল?

মা জননীকে তারা বউ করে নেবে।

তালুকদার সাহেব কোনও কথা বললেন না। মনে আনন্দের ঢেউ বইছে, সেই ঢেউ চেপে উদাস ভঙ্গিতে চা খেতে লাগলেন।

মেছের ঘটক বলল, কিছু বললেন না যে তালুকদার সাহেব?

কী বলব ?

তাদের কথা তো আপনাকে বললাম, আপনার কথা বলবেন না ! আপনার কথা তাদেরকে গিয়ে আমার বলতে হবে না!

তুমি কি একথা বলার জন্যই আমার বাড়িতে যেতে চেয়েছিলে?

জ্বী !

কবে তোমার সঙ্গে ওদের কথা হয়েছে?

পরশু।

তুমি নিজ থেকে খবর নিতে গিয়েছিলে না ওরা খবর পাঠাল?

আমি যাইনি, ওরাও খবর পাঠায়নি। সরাসরি লোক পাঠিয়েছিল আমার বাড়িতে।

তাই নাকি?

জ্বী!

কাকে পাঠিয়েছিল?

ছেলের মেজবোন জামাইকে।

ওই যে কালোপানা লোকটা?
জ্বী!
কী বলল এসে?
চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিল মেছের ঘটক। তাদের মতামত জানাল। এখন আপনারটা জানতে পারলে পাকা কথা আমি বলতে পারি।
তালুকদার সাহেবও তাঁর চায়ে শেষ চুমুক দিলেন। তুমি আমাকে সত্যি করে একটা কথা বল তো ঘটক।
ঘটক সঙ্গে সঙ্গে বলল, আমি তো মিথ্যে করে কোনও কথা কখনও বলি না তালুকদার সাহেব।
না না আমি সেভাবে বলিনি, তুমি ভুল বুঝ না।
ঠিক আছে বলুন।
সত্যি কি ওদের কোনও ডিমান্ড নেই?
না সত্যি নেই।
তারপর একটু থেমে বলল, তবে আমার আছে।
তালুকদার সাহেব একটু অবাক হলেন। তোমার আবার কিসের ডিমান্ড?
সেটা এখন বলব না।
কখন বলবে?
মা জননীর বিয়ের দিন।
তোমার ডিমান্ডটা আমি বুঝেছি।
কত বলুন তো?
এই ছেলের সঙ্গে আলতার যদি বিয়ে হয়, তাহলে তোমার অংকটাও আমি ওই বিয়ের দিনই বলব।
ঘটক হো হো করে হাসল। আপনি খুবই বুদ্ধিমান লোক তালুকদার সাহেব।
তারপর যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল, যদি বিয়ে হয় কথাটার মানে কী? ছেলে কি আপনার পছন্দ না?
পছন্দ।
তাহলে?
মেয়ের মায়ের পছন্দ কী না জানতে হবে না?
এখনও জানেননি?
কী করে জানব! তুমি তো কোনও সংবাদ দাওনি।
তাহলে আজ গিয়ে জানুন।
তাতো জানবই।
চলুন তাহলে উঠি।
তোমার কি কোনও তাড়া আছে?
না। এমনি উঠতে চাচ্ছি।
আর একটু বস।
ঠিক আছে।
আরেক কাপ চা খাবে?
না না। দু কাপ খেয়ে ফেলেছি। আপনি খেলে খান।

না আমিও আর খাব না।

তারপর একটু চুপ করে থেকে তালুকদার সাহেব বললেন, সব ঠিক ঠাক হলে কবে নাগাদ বিয়ে হতে পারে?

মেছের ঘটক সঙ্গে সঙ্গে বলল, আপনি যখন বলবেন।

তা তো বুঝলাম কিন্তু ওদের কোনও বক্তব্য নেই?

আছে।

কবে?

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। ছেলের বিয়ে করার কারণটা তো আপনি জানেনই। ছেলের মা অসুস্থ।

তা জানি।

তারপর উঠলেন তালুকদার সাহেব। ঠিক আছে, দুতিনদিন পর তুমি আমার বাড়ি আস। এই ফাঁকে মেয়ের মার সঙ্গে আমি কথা বলি।

মেছের ঘটক উঠল। মেয়ের সঙ্গেও কথা বলবেন।

মেয়ের সঙ্গে কী কথা বলব?

বাহ্ মা জননীর মতামতটা নেবেন না! সে এখানে বিয়ে করতে রাজি কী না, তার নিজের কোনও .....।

কথাটা শেষ করল না মেছের ঘটক। হাসল। আপনি তো বুঝতেই পারছেন তালুকদার সাহেব। আজকালকার ছেলেমেয়েদের কথা তো বলা যায় না। তাদের নিজেদের পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে!

তালুকদার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, আমার মেয়ে অমন না। আমার মেয়েকে আমি খুব ভাল করে চিনি। আমি কিংবা মেয়ের মা যা বলবে মেয়ে তাই শুনবে। হাত পা বেঁধে নদীতে ফেলে দিলেও মেয়ে কোনও কথা বলবে না।

তালুকদার সাহেবের কথা শুনে হে হে করে হাসল মেছের ঘটক। তবে তো আর কোনও কথাই নেই।

রোকেয়া বললেন, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। দুপুরের খাওয়া দাওয়া শেষ করে বিছানায় একটু গড়িয়ে নিচ্ছেন তালুকদার সাহেব। স্ত্রীর কথা শুনে উঠে বসলেন। মুখখানা হাসি হাসি করে বললেন, তোমার সঙ্গেও আমার কথা আছে।

পালঙ্কের কোণে বসলেন রোকেয়া। কী কথা?

আগে তোমারটা বল, শুনি। তারপর আমারটা বলব।

না আগে তোমারটা বল।

মেছের ঘটকের সঙ্গে দেখা হওয়া, চা খাওয়া ইত্যাদি ইত্যাদি বেশ গুছিয়ে বললেন তালুকদার সাহেব। শুনে রোকেয়া কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিক চুপ করে থেকে বললেন, কী বলল সে?

আলতাকে ওরা পছন্দ করেছে।

তারপর ?

তারপর আবার কী! আমরা মতামত দিলেই বিয়ে হবে। ছেলেটা আমার খুব পছন্দ। আলতাকে আমি এই ছেলের সঙ্গেই বিয়ে দেব। কবে দেব সেই বিষয়ে তোমার সঙ্গে এখন কথা বলব। পরশুদিন মেছের ঘটক আসবে। কোন মাসে বিয়ে হবে সেটাবলে দিলে ঘটক গিয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলবে। ওরা তখন দিন তারিখ দিতে আসবে।

রোকেয়া কোনও কথা বললেন না। চেহারায় কী রকম একটা চিন্তিত ভাব।

ব্যাপারটা খেয়াল করলেন তালুকদার সাহেব। করে অবাক হলেন। কী হয়েছে তোমার?

স্বামীর দিকে তাকালেন রোকেয়া। কী হবে? কিচ্ছু হয়নি।

তাহলে তোমাকে এমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

কোথায় চিন্তিত দেখাচ্ছে?

দেখাচ্ছে।

তারপর একটু থেমে বললেন, ঠিক আছে এবার তোমার কথাটা বল।

রোকেয়া একটু নড়েচড়ে উঠলেন। আমার কথাটাও আলতার বিয়ে নিয়েই।

তাই নাকি!

হ্যাঁ।

কথাটা তাহলে বল।

না মানে তুমি কি সত্যি সত্যি এই ছেলের কাছে আলতাকে বিয়ে দিতে চাও?

হ্যাঁ। ছেলে তো খুব ভাল। এরচেয়ে ভাল ছেলে কি আলতার জন্য আমরা পাব! তাছাড়া মেয়েটির আমাদের গায়ের রঙ কালো।

রঙে কিছু যায় আসে না?

যায় আসে। অনেক কিছু যায় আসে।

রোকেয়া একটু চুপ করে রইলেন।

তালুকদার সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন। তুমি যেন কী বলতে চেয়েও বলছ না?

স্বামীর দিকে মুখ ফেরালেন রোকেয়া। না তেমন কিছু না। তোমাকে একটা কথা বলব?

বল।

তুমি রেগে যাবে না তো?

রাগ করার মতো কথা হলে তো রাগবই।

কথাটা আসলে রাগ করার মতো নয়। ভাববার মতো।

কী বল তো!

না মানে আমি বলছিলাম কী, আমাদের যে কালে বিয়ে টিয়ে হয়েছে তখনকার আর এখনকার দিনের মধ্যে অনেক ব্যবধান। আজকালকার ছেলেমেয়েরা অনেক কিছু জানতে বুঝতে চায়।

কী রকম?

অতকিছু তো তোমাকে বুঝিয়ে বলা মুশকিল। যা হোক এতকিছু বলে লাভ নেই। আমি শুধু একটি কথা বলি, যেখানে, মানে যে ছেলের সঙ্গে আলতার তুমি বিয়ে দিতে চাইছ– এই বিয়েতে আলতার মত আছে কিনা এটা বোধহয় আমাদের একটু জানা দরকার।

তালুকদার সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, কেন?

মেয়েটিরও তো একটা মতামত থাকতে পারে।

মেয়ের আবার কী মতামত?

বাহ্ থাকতে পারে না!

না পারে না।

কেন?

আমি মেয়ের বাবা, তুমি মেয়ের মা, মেয়ের ব্যাপারে আমরা যা সিদ্ধান্ত নেব মেয়েকে তাই মেনে

নিতে হবে। কারণ মেয়ের ভালমন্দ বিবেচনা করেই কাজটা আমরা করছি। মেয়ে সুখে শান্তিতে জীবন কাটাতে পারবে ভেবেই করছি। ঠিক কী না?

তাতো ঠিকই।

তাহলে?

আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কী, বাইরের সুখটাই তো আসল সুখ নয়, মনের সুখটাই আসল।

মানে?

রোকেয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। ব্যাপারটা যে কেমন করে তোমাকে বোঝাই!

তালুকদার সাহেব আবার গম্ভীর হলেন, আমি খানিকটা বুঝতে পারছি।

কী বুঝতে পারছ বল তো!

বলব না।

তাহলে?

আমি তোমার মুখ থেকে শুনব। তোমাকে এখন যা যা প্রশ্ন করব তার ঠিকঠিক জবাব তুমি আমাকে দেবে।

রোকেয়া চুপ করে রইলেন।

তালুকদার সাহেব বললেন, বিয়ের ব্যাপারে আলতা কি তোমাকে কিছু বলেছে?

বলেছে।

কী?

এই ছেলে ওর পছন্দ নয়।

মানে?

মানে আবার কী! একজন মানুষকে তো আরেকজন মানুষের পছন্দ নাও হতে পারে।

তা পারে।

তারপর একটু চুপ করে থেকে তালুকদার সাহেব বললেন, তাহলে কী রকম ছেলে পছন্দ আলতার?

রোকেয়া কথা বললেন না।

তালুকদার সাহেব একটু রাগলেন। কথা বলছ না কেন?

কী বলব?

কী রকম ছেলে পছন্দ আলতার? কাকে পছন্দ?

স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় রোকেয়া বললেন, মনজুর মতো ছেলে। মনজুকে পছন্দ আলতার।

১১

স্ত্রীর কথা যেন বুঝতে পারলেন না তালুকদার সাহেব। ফ্যাল ফ্যাল করে খানিক তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, কী বললে?

জানালা দিয়ে বাহিরে তাকিয়ে ছিলেন রোকেয়া। স্বামীর কথায় তাঁর দিকে মুখ ফেরালেন। তুমি শোননি?

শুনেছি।

তাহলে?

ঠিক বুঝতে পারিনি। আবার বল।

মনজুর মতো ছেলে পছন্দ আলতার।

মনজুর মতো না মনজুকেই?

এই কথাটাও তোমাকে আমি বলে ফেলেছি।

তবু আবার বল।

একজন মানুষের মতো কি আরেকজন মানুষ হয়?

তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

কথাটা খুব সোজা। মনজুর মতো ছেলে মানে মনজুকেই তোমার মেয়ের পছন্দ।

তালুকদার সাহেব আগের চেয়েও বেশি গম্ভীর হলেন। আলতা তোমাকে সরাসরি বলেছে যে মনজুকেই তার পছন্দ?

রোকেয়া গম্ভীর হলেন। মেয়েরা কি সরাসরি বলে?

কখনও কখনও বলে। তাছাড়া তোমার মেয়ের সঙ্গে তোমার যা ভাব তাতে তার সরাসরিই বলার কথা।

মনে কর সরাসরিই বলেছে।

কী বলেছে?

আবার ওই একই প্রশ্ন করছ।

এক প্রশ্ন নয়। আলাদা।

কী রকম আলাদা?

তুমি নিশ্চয় বুঝেছ। যাহোক, তুমি আমাকে বল আলতা আসলে কী বলেছে, পয়সার ছেলেটিকে সে বিয়ে করবে না একথা সরাসরি বলেছে?

না।

তাহলে?

বলেছে মনজু ছাড়া অন্য কাউকে তার পছন্দ নয়।

মনজু ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না এ কথা কি বলেছে?

না।

তারপর স্বামীর দিকে চোখ তুলে তাকালেন রোকেয়া। আগের কথাটা বললে পরের কথাটা বলার আর দরকার হয় না।

হ্যাঁ ওটা এভাবেই বোঝা যায়।

একটু থেমে তালুকদার সাহেব বললেন, মনজুর সঙ্গে কি ওর কোনও সম্পর্ক হয়েছে?

রোকেয়া একটু চমকালেন। কী ধরনের সম্পর্কের কথা বলছ?

তুমি বুঝতে পারনি?

পেরেছি।

তাহলে?

না মানে তেমন কিছু হয়েছে বলে আমার মনে হয় না।

কথাটা বলেই ভেতরে ভেতরে থমকালেন রোকেয়া। সে রাতে ঘাটলায় মনজু এবং আলতাকে তিনি দেখেছেন। ওদের কথা শুনেছেন। যা বোঝার পরিষ্কার বুঝেছেন। পরে ওই নিয়ে আলতার সঙ্গে তাঁর কথাও হয়েছে। কিন্তু স্বামীর কাছে কেমন করে ওসব তিনি বলেন!

তালুকদার সাহেব বললেন, আমাকে তুমি সব খুলে বল।

রোকেয়া মৃদু গলায় বললেন, সব তো খুলেই বলছি।

সম্পর্কটা কতটা গভীর?
তা আমি কেমন করে বলব!
তুমি যতটা বুঝেছ ততটাই বল।
ছেলেবেলা থেকে মনজুকে দেখে আসছে তোমার মেয়ে। দেখতে দেখতে একটা টান ভালবাসা তৈরি হয়েছে। তাছাড়া মনজু দেখতে অত সুন্দর ছেলে।
সুন্দর হলে কি হবে, আসলে তো মাকাল ফল।
কী রকম?
বি এ পাস করার পরও তো কিছু করতে পারছে না।
এখন হয়ত পারছে না, ভবিষ্যতে পারবে।
নাও পারতে পারে।
রোকেয়া কথা বললেন না।
তালুকদার সাহেব বললেন, তোমার মেয়ের দুর্ভাগ্য!
রোকেয়া চমকালেন। কী রকম?
একটি মাকাল ফলকে সে পছন্দ করেছে। যার সঙ্গে মরে গেলেও তার বিয়ে আমি দেব না।
কেন দেবে না?
ওই যে বললাম মাকাল ফল। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে আমার মেয়ে সুখি হবে না।
কে বলেছে তোমাকে?
আমি বলছি।
কেন হবে না?
আমার মেয়েকে ও খাওয়াবে কী?
ও আর ওর মা যা খায় তাই।
ওসব শাকপাতা আর কচু ঘেচু আমার মেয়ে খেতে পারবে না।
এই সব খাওয়া দাওয়ার কথা কি কোনও মেয়ে ভাবে?
প্রথম প্রথম ভাবে না। বয়েস কম থাকে বলে হয়ত বোঝেই না। আবেগে চলে। বিয়ের পর টের পায়। এজন্য প্রকৃত বুদ্ধিমান মা বাবা মেয়েদের ওইসব আবেগকে পাত্তা দেয় না। যেমন আমিও দেব না।
কথাটা শুনে খেঁপে উঠলেন রোকেয়া, মানে?
মানে মনজুর সঙ্গে আলতার বিয়ে আমি দেব না। পয়সার ওই ছেলের সঙ্গেই ওর আমি বিয়ে দেব।
তাতে তো তোমার মেয়ে সুখি হবে না।
কে বলেছে?
আমি বলছি।
মেয়েদের সুখের তুমি কি বোঝ?
আমিই তো বুঝি।
কী করে?
আমিও তো মেয়ে। মেয়েরা আসলে মনের সুখকেই বড় সুখ মনে করে।
অভাবের সংসারে মনের সুখ থাকে না।
অভাব যাতে ওদের না থাকে তাই ব্যবস্থা করে দাও।

কী বলতে চাও তুমি?
তুমি বুঝতে পেরেছ কী বলতে চাই আমি।
না বুঝতে পারিনি। পরিষ্কার করে বল।
তার আগে আমি যা যা প্রশ্ন করি তার উত্তর দাও।
বল।
মনজুদের কি বংশ খারাপ?
না। বরং আমাদের চে অনেক ভাল বংশ।
মনজু কি দেখতে খারাপ?
মোটেই না।
মনজুর কি চরিত্র খারাপ? বদমাস ছেলো সে?
না।
মনজুর ব্যবহার?
খুব ভাল।
লেখাপড়া?
আমাদের গ্রামের সেরা ছেলে।
সংসারে মা ছাড়া কেউ নেই।
হ্যাঁ।
তাহলে তার সমস্যাটা কি? কেন তুমি তোমার মেয়েকে মনজুর সঙ্গে বিয়ে দেবে না?
প্রধান কারণ মনজুরা খুব গরিব।
তাতে কী হয়েছে?
গরিব মানুষ আমি দেখতে পারি না।
তো যাতে গরিব না থাকে সেই ব্যবস্থা তুমি করে দেবে।
কেমন করে?
আলতা তোমার একমাত্র মেয়ে। তোমার এত জায়গা সম্পত্তি।
না আমি তা করব না।
একটু চুপ করে থেকে তালুকদার সাহেব বললেন, আমি নিজে পছন্দ করে যদি কোনও গরিব ছেলের সঙ্গে আলতার বিয়ে দিতাম সে ক্ষেত্রে করতাম।
এখন করব না।
কেন?
কারণ মনজুকে আমি পছন্দ করিনি। তোমার মেয়ে করেছে।
খুবই ছেলেমানুষি কথা এটা।
হোক।
তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?
তোমার মেয়েকে বলে দিও, মনজুর সঙ্গে তার বিয়ে আমি দেব না। বিয়ে তাকে পয়সার ওই ছেলের সঙ্গেই দেব।
মেয়ে যদি রাজি না হয়?
তবুও দেব।

যদি কোনও অঘটন ঘটায়?
মানে আত্মহত্যা?
হ্যাঁ।
যদি আত্মহত্যা করার হুমকি দেয়, বলবে, ঠিক আছে কর।
যদি সত্যি সত্যি করে?
করবে।
তারপর উঠে দাঁড়ালেন তালুকদার সাহেব। তবু আমার মত বদলাবে না।

ফুল ফোটে বাগানে
প্রেম হয় গোপনে
প্রথম প্রেম ভেঙে গেলে
সুখ হয় না জীবনে।

পরীর মুখে এই ধরনের কবিতা শুনে আলতা একেবারে স্তব্ধ। অবাক চোখে পরীর মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে বলল, তুই এসব কোথায় শিখলি?
পরী মিষ্টি করে হাসল, শেখার অনেক জায়গা আছে।
কেমন জায়গা বল তো?
কেন তুমি শিখবে?
যদি শিখতে চাই।
আমার কাছ থেকে শেখ।
কিন্তু তুই শিখেছিস কোথায় সেটা আগে বল।
ওটা পরে বলি, তার আগে আরও দুএকটা কবিতা শোন।
আচ্ছা বল।

ঘরের কোণে আমগাছ
কাঁচা আম ঝোলে
কাঁচা নারী ঘরে থুইয়া
কেমনে বিদেশ করে।

এটা কেমন?
আলতা মুগ্ধ গলায় বলল, সুন্দর।
আরও শুনবে?
বল।

বন্ধু এল বাড়িতে
পাতিলে নাই ভাত
কাছে তুমি শুয়ে থাক
গায়ে দিও না হাত।

এটা শুনে আলতা একেবারে খিলখিল করে হেসে উঠল।
পরীও হাসল। এটা একটু অসভ্য কবিতা তাই না আলতাবু?
হ্যাঁ , কিন্তু তুই এসব শিখলি কোথায়?
আমার এক বিয়াইনের কাছে শিখেছি।

নাম কী বিয়াইনের?
শিরিন।
বিয়ে হয়েছে?
না। কিন্তু প্রেম করে।
তাই নাকি?
হ্যাঁ। এইসব কবিতা দিয়ে ছেলেটাকে চিঠি লেখে।
বলিস কি?
হ্যাঁ।
বেশ মজা তো।
একবার বেয়াইনের একটা চিঠি আমি পড়েছিলাম। ওই চিঠিতে একটা কবিতা ছিল। ওই কবিতাটিও ভাল। শুনবে?
বল শুনি।

পান্তাভাতে মরিচ পোড়া
গরম ভাতে ঘি
বন্ধুর সাথে কথা বলতে
লজ্জা আবার কী!

ওরা কথা বলছে আলতার ঘরে বসে। দুপুরের পরপর এসেছে পরী। এখন বিকেল। আলতার ঘরের জানালা দিয়ে বিকেলবেলার রোদ এসে ঢুকেছে। ঝিরঝিরে একটা হাওয়া বইছে। হাওয়ায় লেবুফুলের গন্ধ। এই গন্ধে মনটা কেমন উদাস হল আলতার। জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইল সে।
পরী বলল, যাই আলতাবু।
পরীর দিকে মুখ ফেরাল আলতা। আরেকটা কবিতা শুনিয়ে যা।
পরী সঙ্গে সঙ্গে বলল,

একটি গাছে দুটি মরিচ
পাকলে হয় লাল
তোমার আমার ভালবাসা
থাকবে চিরকাল।

পরী চলে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ পর্যন্ত এই কবিতার দুটি লাইন মনের ভেতর ঘুরে বেড়াল আলতার। আর মনজুর মুখটা স্থির হয়ে রইল চোখের সামনে।

তোমার আমার ভালবাসা
থাকবে চিরকাল।

১২

বাইরে এখন বেলাশেষের বিষণ্ন আলো।
গাছপালার বনে হু হু করছে হাওয়া। বিষয়কর্ম শেষ করে ফিরে আসছে পাখিরা। তাদের কলকাকলিতে মুখর হয়েছে মৌনতা। রাতে ফোটার অপেক্ষায় আছে যেসব কলি ধীর মন্থর ভঙ্গিমায় চোখ খুলতে শুরু করেছে তারা। আর অন্ধকারের প্রতীক্ষায় থাকে যেসব কীট তারা আড়মোড়া ভাঙতে শুরু করেছে। গলা খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে কেউ কেউ।

দিন এবং রাত্রির মাঝখানকার এরকম এক সময়ে নিজের বিছানায় শুয়ে উদাস হয়ে জানালার দিকে তাকিয়ে আছে মনজু। বাইরে আস্তে ধীরে অন্ধকার নামে, তার আগে মনজুর ঘর চলে যায় অন্ধকারের দখলে, মনজু তা খেয়াল করে না।

কিন্তু নিজের ছেলেটিকে খেয়াল করেন বকুল।

হেরিকেন হাতে মনজুর ঘরে এসেছেন বকুল, মনজুকে দেখেন কী রকম যেন নিঝুম হয়ে আছে। অন্ধকারে আলো নিয়ে এলেন মা– মনজু তা খেয়ালই করল না।

বকুলের মনে হল মনজু বুঝি ঘুমোচ্ছে।

কিন্তু এরকম অসময়ে ঘুমোবে কেন?

শরীর খারাপ হল?

জ্বরজ্বারি এল না তো!

মনজুর পড়ার টেবিলে হেরিকেন রেখে ছেলের মাথায় হাত দিলেন বকুল।

মায়ের স্পর্শে চমকে উঠল মনজু।

বকুল বললেন, তোর কি শরীর খারাপ?

মনজু আলতো গলায় বলল, না।

এ সময় তাহলে শুয়ে আছিস কেন?

এমনি।

এমনি নয়। নিশ্চয় কারণ আছে।

বিছানায় উঠে বসল মনজু। কী কারণ থাকবে?

ছেলের বিছানার পাশে বসতে বসতে বকুল বললেন, তা তো আমি জানি না।

না জানলে বললে কেন?

বললাম তোর অবস্থা দেখে। আমি ঘরে এসে ঢুকলাম তুই টেরই পেলি না।

পেয়েছি।

তাহলে যে আমার দিকে তাকালি না।

না তাকাবার কারণ আছে।

কী কারণ?

তোমার দিকে যদি আমি তাকাতাম তুমি ভাবতে আমি জেগে আছি। আমার কপালে তুমি তাহলে হাত দিতে না।

হ্যাঁ দিতাম না। তাতে কী হয়েছে?

আমি চেয়েছি তুমি আমার কপালে হাত দাও।

কেন?

আমার খুব ভাল লাগে।

একথা শুনে বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল বকুলের। মনজুর মাথাটা দুহাতে বুকের কাছে টেনে আনলেন তিনি। একহাতে মাথাটা বুকে চেপে ধরে অন্য হাতটা ছেলের ঘাড়ে পিঠে বুলাতে লাগলেন। বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন, ওরে আমার সোনা রে, ওরে আমার মানিক রে।

মায়ের এরকম আদরে হঠাৎ করে কী যে হল মনজুর, বুকের ভেতর ঠেলে উঠল গভীর কষ্টের এক কান্না। কান্নাটা চেপে রাখার খানিক চেষ্টা করল সে কিন্তু পারল না। দুহাতে মাকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মতো কাঁদতে লাগল।

প্রথমে মনজুর কান্নাটা টের পেলেন না বকুল। তিনি ছিলেন নিজের আবেগে। যখন টের পেলেন

তখন দিশেহারা হয়ে গেলেন। দুহাতে ছেলের মুখ তুলে ধরে আকুল গলায় বললেন, কী হয়েছে? কাঁদছিস কেন?

মনজু কোনও কথা বলল না। কাঁদতে লাগল।

বকুল অস্থির হয়ে গেলেন। কী হয়েছে? বল আমাকে। বল কী হয়েছে?

মনজু তবু কথা বলল না। আস্তে ধীরে নিজেকে সামলাল। অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দুহাতে চোখ মুছতে লাগল।

বকুল চিন্তিত গলায় বললেন, তোকে কেউ কিছু বলেছে?

মনজু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, না।

তাহলে কাঁদলি কেন?

মনজু কথা বলল না।

বকুল বললেন, বেশ কিছুদিন ধরে খেয়াল করছি তুই কেমন যেন হয়ে গেছিস! সারাক্ষণ কী রকম উদাস, আনমনা হয়ে থাকিস। আজ এমন করে কাঁদলি। এসবের পেছনে নিশ্চয় কোনও কারণ আছে। তুই আমার ছেলে। আমার চে' ভাল তোকে আর কে চেনে! আমাকে বল। সব বল আমাকে। কী হয়েছে মনজু?

মৃদু শব্দে গলা খাঁকাড়ি দিল মনজু। নিজেকে নিয়ে কিছুদিন ধরে খুব ভাবছি আমি।

কী ভাবছিস?

জীবনটা এরকম হয়ে রইল আমার। এভাবে কি জীবন চলে? না চাকরি বাকরি হচ্ছে, না তেমন কিছু। এইসব টিউশনি করে কতদিন জীবন চলবে! তুমিই বা আমার কাছ থেকে কী পাচ্ছ?

মানে?

যে ধরনের কষ্ট করে বেঁচে আছ তুমি, আমার বয়সী ছেলে থাকতে কি তেমন করে বেঁচে থাকা উচিত তোমার?

আমার তো মনে হয় না আমি কোনও কষ্টে আছি। তুই যা রোজগার করিস আর আমাদের যা সামান্য জমিজমা, বর্গাদাররা যা দেয়, ভালই তো আছি।

এটা আসলে ভাল থাকা নয় মা। এভাবে কতদিন চলবে?

এসব ভেবেই কি কাঁদলি তুই?

মনজু চুপ করে রইল।

বকুল বললেন, কথা বল।

মনজু নরম গলায় বলল, কী বলব?

আমার মনে হচ্ছে তোর আজকের এই কান্নার পেছনে অন্য কোনও কারণও আছে।

আর কী কারণ থাকবে?

থাকতে পারে।

মনজু মাথা নিচু করল।

বকুল বললেন, সব কথাই আমাকে তুই বলতে পারিস।

হ্যাঁ তোমাকেই আমার বলা উচিত। তুমি ছাড়া আর কাকে বলব! কে আছে আমার!

বল তাহলে।

কেমন করে যে বলব!

বকুল তীক্ষ্ণ চোখে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। কী হয়েছে?

না মানে আলতার বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে।

কথাটা যেন বুঝতে পারলেন না বকুল। বললেন, আলতার বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে মানে! বিয়ে তো ঠিক হবেই। আলতা বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে না?

তা তো হয়েছেই।

একথার পরই যেন ব্যাপারটা খানিক বুঝতে পারলেন বকুল। আবার তীক্ষ্ণ চোখে মনজুর মুখের দিকে তাকালেন তিনি। আলতার বিয়ে ঠিক হয়ে যাচ্ছে তাতে তোর কী?

মনজু মাথা নিচু করে রইল। কথা বলল না।

বকুল বললেন, কথা বলছিস না কেন?

কী বলব?

আমি যা প্রশ্ন করছি তার উত্তর দে।

উত্তর দেয়ার কিছু নেই।

তাহলে আমি বুঝব কী করে?

আমার মনে হয় বুঝতে তুমি পারছ। তারপরও আমি তোমাকে সরাসরিই বলি, আলতা তোমার বউ হতে চায়।

কী?

হ্যাঁ।

বকুল ফ্যাল ফ্যাল করে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কথা ভাববার চেষ্টা করলেন। তবে সেসব কথার প্রতিটিই আলতাকে নিয়ে। আলতার যখন তখন এই বাড়িতে আসা, আত্মীয় না হয়েও আত্মীয়র চে' অনেক অনেক গভীর আচরণ করা, তাঁর জন্য আলতার টান, মনজুর জন্য উদ্বেগ ইত্যাদি সবই তাঁর মনে পড়ল। যেদিন আলতাকে দেখতে এল সেদিন দুপুরের মুখে মুখে আলতার এই বাড়িতে আসা, তার উদাস মন খারাপ ভাব এসবও মনে পড়ল। এবং এতদিন পর আজ আলতার সেদিনকার উদাস উদাস ভাব এবং মন খারাপ করা কথাবার্তার অর্থ বকুলের কাছে পরিষ্কার হল। খানিক আগে মনজু অমন করে কেঁদেছে সেই কান্না দেখে মনটা যত না খারাপ হয়েছিল তারচে অনেক বেশি ভাল হয়ে গেল।

মুগ্ধ গলায় বকুল বললেন, সত্যি?

মনজু নরম গলায় বলল, সত্যি।

তোকে বলেছে? মানে তোর সঙ্গে এসব নিয়ে কথা হয়েছে?

হ্যাঁ।

বকুল তারপর শিশুর মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে গেলেন। খুবই ভাল কথা শোনালি বাবা। অনেক কাল পর খুবই ভাল একটা কথা শুনলাম। আলতার মতো মেয়ে তোর বউ হলে তোকে নিয়ে আমার আর কোনও চিন্তা থাকবে না। নিশ্চিন্তে মরতে পারব আমি।

মনজু বলল, কিন্তু ব্যাপারটা তো খুব জটিল মা।

কী রকম জটিল?

ওরা রাজি হবে?

ওরা মানে?

আলতার মা বাবা?

কেন হবে না? তুই কি আলতার অনুপযুক্ত? তোর মতো ছেলে এই গ্রামে আর কে আছে?

কিন্তু আমরা তো খুব গরিব।

তাতে কী হয়েছে! দুনিয়ার সব মানুষ বড়লোক হয় নাকি? গরিবের ছেলেদের পয়সাঅলা লোকের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয় না?

হয়।

তাহলে?

জটিলতা তো আরও আছে।

আবার কিসের জটিলতা?

পয়সা থেকে আলতাকে যে দেখে গেল!

তাতে কী হয়েছে?

ওরা যদি আলতাকে পছন্দ করে?

করলে করবে।

তাহলে?

তাহলে আবার কী! পছন্দ করলেই তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না।তার আগেই আলতার মা বাবার সঙ্গে আমি কথা বলব।

তুমি নিজে বলবে না ঘটক পাঠাবে?

আমি নিজে বলব।

কী বলবে?

বলব আলতাকে আমি আমার বাড়ির বউ করতে চাই।

আলতার মা বাবা যদি রাজি না হন?

একথায় বকুল বেশ বিরক্ত হলেন। আগ বাড়িয়ে অলুক্ষণে কথা বলিস না তো! রাজি হবে না কেন? আমি নিজে তাদের সঙ্গে কথা বলব।

তারপর একটু থেমে বকুল বললেন, আমার মনে হয় রাজি তাঁরা হবেন।

মনজু চিন্তিত গলায় বলল, কিন্তু বিয়ের খরচ টরচ আসবে কোত্থেকে?

ওসব তোর চিন্তা করতে হবে না।

আমি ছাড়া আর কে চিন্তা করবে?

কেন? আমি আছি না! আমি কি মরে গেছি!

কিন্তু তুমি ব্যবস্থা করবে কী করে?

কী করে করব আমি জানি।

আমাকে একটু খুলে বল।

জমি যেটুকু আছে সব বিক্রি করে দেব।

তারপর?

তারপর আবার কী?

আমাদের চলবে কী করে?

সে দেখা যাবে।

তারপর একটু থেমে বকুল বললেন, এসব নিয়ে তুই আর ভাবিস না তো। যা করার আমি করছি।

১৩

প্রিয়তম

প্রেমের চিঠি কেমন করে লিখতে হয় আমি জানি না। কিন্তু তোমাকে আমার খুব লিখতে ইচ্ছে করছে। অনেক কথা লিখতে ইচ্ছে করছে। আমার মনের সব কথা তোমাকে আমার বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমি জানি, সারাজীবন ধরে বললেও তোমার জন্য জমিয়ে রাখা আমার মনের সব কথা তোমাকে আমি বলে শেষ করতে পারব না। তাই এই মুহূর্তে আমি শুধু তোমাকে একটি কথা বলতে চাই, আমি তোমাকে ভালবাসি।

আমি তোমাকে খুব ভালবাসি।

এমন ভাল নিজেকেও বাসি না আমি। তোমার জন্য এ জীবন হাসি-মুখে বিসর্জন দিতে পারি আমি। কিন্তু আমার কথা শুধু একটাই–

আমার যত ভালবাসা
দেব তোমার পায়
তুমি বন্ধু উঠে এসো
আমার ভাঙা নায়।

আমি তোমাকে চাই। প্রিয়তম, আমি শুধু তোমাকে চাই। তুমি আমার জীবন মরণ, আমার হাসি-আনন্দ। আমার প্রেমিক, আমার স্বামী। আমার বন্ধু, আমার সব। সবকিছু তুমি। শুধু তুমি।

তুমি আমার খেলার সাথী
আমার চোখের মণি
তুমি আমার কবিতার সুর
আমার গানের বাণী।

তোমাকে ছাড়া কিছুই ভাবতে পারি না আমি। কিচ্ছু ভাবতে পারি না। আমার সব ভাবনা তোমাকে নিয়ে। আমার সব আশা তোমাকে নিয়ে। সব স্বপ্ন তোমাকে নিয়ে।

তুমি মোর জীবনের স্বপ্ন সাধনা বাসনা
তুমি মোর প্রেমপ্রীতি ভালবাসা কামনা।

আমার মন তোমাকে ছাড়া কাউকে দিতে পারব না আমি। আমার দেহ তুমি ছাড়া আর কোনও পুরুষ স্পর্শ করতে পারবে না। আমি তোমার। শুধু তোমার। মনে প্রাণে দেহে, শুধু তোমারই আমি।

আমার মাঝে তোমার লীলা হবে
তাই তো আমি এসেছি এই ভবে।

যে যাই বলুক তোমাকে আমি ছাড়তে পারব না। ভুলতে পারব না। বাঁচি যদি, তোমার হাত ধরে বাঁচব। মরি যদি, তোমার কোলে মাথা রেখে মরব।

প্রাণ দিয়েছি
মন দিয়েছি
সব দিয়েছি যারে
মুখের কথায়
হঠাৎ করে
যায় কি ভোলা তারে!

আমি তোমাকে ভালবাসি। তোমাকে পাওয়া আমার জীবনের সব চাইতে বড় বাসনা। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাজার বার মরে যেতে পারি আমি।
আজ তবে বিদায় প্রিয়তম।

পত্রের মাঝে লিখে দিলাম
অন্তরের ভালবাসা
তুমি আমার জীবন মরণ
তুমি সকল আশা।

আলতাকে দেখে ছুটে বেরুল পরী। আলতাবু তুমি!
আলতা হাসিমুখে বলল, হ্যাঁ আমি।
হঠাৎ আমাদের বাড়িতে?
তোর সঙ্গে দেখা করতে এলাম।
বল কী?
হ্যাঁ।
বিশ্বাস হচ্ছে না।
সত্যি।
দুহাত ধরে আলতাকে টানল পরী। বস বস।
না ঘরে বসব না।
তাহলে?
বাইরে চল।
কেন?
তোর সঙ্গে কথা আছে।
কী কথা?
বাইরে চল। বাইরে গিয়ে বলব।
এখানে অসুবিধা কী?
তোর মা বাবা।
এ ঘরে এখন কেউ আসবে না। মা রান্নাঘরে, বাবা বাংলা ঘরে।
হোক, তবু বাইরে চল।
কিন্তু বাইরে কোথায়?
আমাদের বাগানের দিকে চল।
চল।
কবরেজ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আলতাদের বাড়ির পেছন দিককার বাগানে চলে এল ওরা দু'জন।
পরী বলল, এখন বল কী কথা?
আলতা অনুনয়ের গলায় বলল, তুই আমার একটা কাজ করে দিবি পরী?
কী কাজ?
বলতে কেমন যেন লাগছে।
বল কী!
হ্যাঁ।

এখানে ডেকে আনলে বলার জন্য আর এখন বলছ বলতে কেমন যেন লাগছে।
সত্যি কেমন যেন লাগছে।
পরী তীক্ষ্ণ চোখে আলতার মুখের দিকে তাকাল। তোমার লক্ষণটা খুব খারাপ আলতাবু।
কী রকম?
আমি তো কবরেজ বাড়ির মেয়ে, এই সব অসুখের লক্ষণ বুঝতে পারি।
অসুখ মানে! আমার তো কোনও অসুখ করেনি।
করেছে। এবং অসুখের নামটাও আমি তোমাকে বলে দিতে পারি।
বল তো!
তোমার অসুখের নাম প্রেমরোগ।
কী?
হ্যাঁ।
তারপর একটু থেমে পরী বলল, তুমি কারও প্রেমে পড়েছ।
কী করে বুঝলি?
আগে বল আমার কথাটা ঠিক কী না?
ঠিক।
তুমি কার প্রেমে পড়েছ ইচ্ছে করলে সেই কথাটাও আমি তোমাকে বলে দিতে পারি।
বল তো!
কিন্তু তার আগে একটা কথা দিতে হবে।
কী কথা?
তুমি আমার কাছে কিছু লুকোতে পারবে না।
ঠিক আছে।
অস্বীকার করতে পারবে না।
মিথ্যে হলে তো অস্বীকার করবই।
সত্য হলে?
স্বীকার করব।
সত্যি?
সত্যি।
তুমি মনজু ভাইর প্রেমে পড়েছ।
পরীর কথা শুনে আলতা একেবারে কেঁপে উঠল। অপলক চোখ পরীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।
পরী বলল, কী ঠিক কি না?
আলতা ধীর গলায় বলল, ঠিক।
তারপর একটু থেমে বলল, কিন্তু তুই বুঝলি কী করে?
একটা দৃশ্য দেখে।
কোন দৃশ্য?
ওই যে পাত্রপক্ষ তোমাকে যেদিন দেখতে এল, দৃশ্যটি সেদিনকার।
কিন্তু দৃশ্যটা কী?
পাত্রপক্ষের সামনে বসে অদ্ভুত এক চোখে মনজু ভাইর দিকে তাকিয়ে ছিলে তুমি। বল তাকাওনি?
হ্যাঁ তাকিয়েছি।

ওই দেখে আমি বুঝে গেছি।
কিন্তু তুই দেখলি কোত্থেকে?
তোমার ঘরের জানালা থেকে।
ওই তাকানো দেখে তুই বুঝে গেলি?
হ্যাঁ।
আলতা একটু আনমনা হল। ঠিকই বুঝেছিস।
পরী সঙ্গে সঙ্গে বলল, এবার তাহলে বল কাজটা কী?
মনজু ভাইকে আমি একটা ....।
আলতার কথা শেষ হওয়ার আগেই পরী বলল, এখনও ভাই বলছ?
তাহলে কী বলব?
শুধু নাম ধরে বলবে।
হ্যাঁ তাই বলা উচিত।
ঠিক আছে দাও।
আলতা আবার চমকাল। কী দেব?
মনজু ভাইকে তুমি চিঠি লিখেছ না?
কিন্তু আমি তো তোকে সেকথা বলিনি।
পরী হাসল। আমি বুঝে ফেলেছি।
কী করে?
তোমার আচরণে।
আলতা হাসল। তুই সত্যি একটা অদ্ভুত মেয়ে।
মোটেই অদ্ভুত নই।
নাহলে এতসব বুঝছিস কী করে?
একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায়। তবে আমার ওপর তুমি ভরসা রাখতে পার। খুব সাবধানে তোমার চিঠি মনজু ভাইকে পৌঁছে দেব আমি।
আর মনজুরটা?
তোমাকে পৌঁছে দেব। কেউ টের পাবে না।
বুকের কাছে লুকিয়ে রাখা ভাঁজ করা চিঠিটা বের করে পরীর হাতে দিল আলতা। পরী সঙ্গে সঙ্গে তা ফ্রকের ভেতর বুকের কাছে লুকিয়ে ফেলল। তারপর বলল, কিন্তু মনজু ভাইর সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে কেমন করে? তোমার বাবা রাজি হবেন?
আলতা বলল, দেখা যাক।

১৪

কয়েক দিন ধরে খুব প্রেমের গান মনে আসে মনজুর।
যখন একা থাকে তখন খুব আলতার কথা ভাবে। যখন আলতার কথা ভাবে তখন মনের ভেতর গুনগুনিয়ে ওঠে কত যে গান!
প্রেমের গান।
ভালবাসার গান।
এখনও তাই হচ্ছিল।

এখন বিকেলের টিউশনিতে যাবে মনজু। শার্ট প্যান্ট পরে রেডি হয়েছে, মনের ভেতর গুনগুনানিয়ে উঠল,

আমি এত যে তোমায় ভালবেসেছি
তবু মনে হয়
এ যেন গো কিছু নয়
কেন আরও ভালবেসে যেতে
পারে না হৃদয়।

এই গানটি গুনগুন করে গাইতে গাইতে বাড়ি থেকে বেরুল মনজু। তারপর কখন কোন ফাঁকে যে এই গান শেষ করে আরেক গান ধরল,

তোমার সঙ্গে দেখা না হলে
ভালবাসার দেখাটা
আমার দেখা হত না।

কিন্তু এই গানটি পুরো জানে মনজু। যেটুকু পারল গাইল। তারপর ধরল অন্য গান,

ভালবাস তুমি
শুনেছি অনেক বার
তবু সেদিনের মতো
লাগেনি তো
কভু আর।

এই গানে মগ্ন হয়ে কবরেজ বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছে মনজু, বাড়ির ভেতর থেকে পরী ছুটে এল।

মনজু ভাই।

মনজু থতমত খেল। দাঁড়াল। তুই কি আমাকে ডাকলি!

পরী হাসল না।

তাহলে?

ডেকেছি আমার দুলাভাইকে।

মনজু অবাক হল। কই এখানে তো আমি ছাড়া কেউ নেই!

হ্যাঁ।

তুই তাহলে দুলাভাই পেলি কোথায়?

এখানেই।

মানে?

ধরুন আপনাকেই আমি দুলাভাই ডাকছি।

কী বলছিস পাগলের মতো!

পাগলের মতো বলব কেন? আপনি আমার দুলাভাই হতে পারেন না?

অন্য সময় হলে মনজু হয়ত রেগে যেত।

পরীর বয়সী মেয়ের এই ধরনের কথা সে পছন্দ করে না।

কিন্তু আজ করল।

প্রেমে পড়ার পর মানুষের মন খুব অন্য রকম হয়ে যায়।

মনজুরও হয়েছে।

পরীর দিকে তাকিয়ে হাসল মনজু। আমি কেমন করে তোর দুলাভাই হতে পারি বল তো! তোর

বোনের তো বিয়ে হয়ে গেছে।
পরী সাথে সাথে বলল, হ্যাঁ এক জনের হয়েছে।
মনজু অবাক হল। তোর বোন তো একজনই।
না আরেকজন আছে।
কী বলছিস তুই?
ঠিকই বলছি।
কই, কোথায় সে?
আছে।
কোথায় আছে বল।
এই গ্রামেই আছে।
দেখা তো আমাকে।
আমাদের বাড়িতে থাকে না?
তাহলে কোন বাড়িতে থাকে।
তালুকদার বাড়িতে।
মনে মনে ব্যাপারটা বুঝে গেল মনজু। বুঝে ভেতরে ভেতরে বেশ একটা ধাক্কা খেল। তারপর গেল গম্ভীর হয়ে।
পরী আড়চোখে মনজুকে একবার দেখল। তারপর মজার গলায় বলল, আমার সেই বোনটির নাম আলতা। আলতাবুকে আপনার কাছে আমরা বিয়ে দেব। এজন্য আপনি আমার দুলাভাই।
মনজু বুঝল তার এবং আলতার ব্যাপারটা পরী জেনেছে। নিশ্চয় আলতার কাছ থেকেই জেনেছে। সুতরাং পরীর কাছে আর লুকোবার কিছু নেই। মনজু সরল গলায় বলল, কিন্তু আলতাকে তুই কেমন করে আমার কাছে বিয়ে দিবি?
পরী বলল, কেন অসুবিধা কী?
আলতার তো অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।
ওই বিয়ে ভেঙ্গে যাবে।
কেমন করে?
আলতাবুই ভেঙ্গে দেবে। শুনুন দুলাভাই, আলতাবু আপনাকে বলেছে,
নদীর মাঝে উঠছে তুফান

মাঝখানে তার ঢেউ
তোমার আমার মাঝখানেতে
আসবে না আর কেউ।

তাই নাকি!
হ্যাঁ।
আর কিছু বলেনি?
বলেছে।
কী?
বলেছে আপনাকে একটা রুমাল দেবে।
কেন রুমাল কেন?

তা তো আমি জানি না।
না না রুমাল যেন না দেয়।
কেন?
রুমাল দিলে ছাড়াছাড়ি হয়।
এই রুমাল ছাড়াছাড়ির রুমাল নয়।
তাহলে?
এই রুমাল ভালবাসার রুমাল। আদরের রুমাল। ওই রুমালে লেখা থাকবে,

আদর করে দিলাম রুমাল
যত্ন করে রেখো
আমার কথা মনে পড়লে
রুমাল খুলে দেখো।

এতে তো বোঝা যাচ্ছে আলতার অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে যাচ্ছে!
পরী ঠোঁট বাঁকাল। আপনি তো মাস্টার মানুষ এজন্য সব কথা বাঁকা করে ভাবেন। অন্য জায়গায় যদি আলতাবুর বিয়ে ঠিক হয় তাহলে আলতাবুকে নিয়ে আপনি ভেগে যাবেন।
কোথায় ভেগে যাব?
তা আমি কী জানি।
মনজু মজার গলায় বলল, না জানলে বলছিস কেন?
পরী কথা বলল না।
মনজু বলল, অনেক্ষণ তোর সঙ্গে কথা বললাম, এবার যাব। অনেক দেরি হয়ে গেছে।
পরী নির্বিকার গলায় বলল, ঠিক আছে।
মনজু অবাক হল। কিন্তু তুই আমাকে ডেকেছিলি কেন?
আপনার একটা জিনিস আছে আমার কাছে।
কী জিনিস?
চিঠি।
তাই নাকি।
হ্যাঁ।
কে লিখেছে?
লিখেছে একজন।
দে তাহলে।
পরে দেব।
কেন?
আপনি তো এখন ব্যস্ত।
কে বলেছে?
আপনি বললেন না? অনেক দেরি হয়ে গেছে।
মনজু হাসল ইস তুই যা হয়েছিস না! দে তাড়াতাড়ি চিঠিটা দেখ বুকের কাছ থেকে চিঠিটা বের করে মনজুর হাতে দিল পরী।
অতি সাবধানে চিঠিটা বুক পকেটে রাখল মনজু। ঠিক আছে এখন তাহলে যাই।
আলতাবুকে চিঠি দেবেন না আপনি?

দেব।
কবে?
কালই।
কখন দেবেন?
এই সময়।
এখান দিয়ে যাওয়ার সময় আমার কাছে দিয়ে যাবেন?
হ্যাঁ।
তাহলে এখন কিছু একটা বলে যান আমি আলতাবুকে দিয়ে বলি।
মনজু দুষ্টুমির সুরে বলল, গিয়ে বল, আমি কোনও কালো মেয়েকে বিয়ে করতে পারব না।
পরী ঠোঁট উল্টে বলল, ঠিক আছে বলব। তার আগে আমার কাছে শুনে যান,

দুধের স্বাদ ঘোলে মেটে না,
প্রেমিক ছাড়া প্রেম জমে না।
রূপেতে বাসিনি ভাল
ভালবাসি কালো,
তুমি প্রিয়া রূপহীনা
তাই লাগে ভাল।

তালুকদার সাহেবকে দেখ বকুল একেবারে হকচকিয়ে গেলেন।
ভাই সাহেব, আপনি হঠাৎ আমাদের বাড়িতে!
তালুকদার সাহেব নরম মুখ করে হাসলেন। এলাম আপনার একটু খোঁজ খবর নিতে।
বসুন, বসুন।
ঘরের ভেতর থেকে একটা চেয়ার টেনে আনলেন বকুল।
সেই চেয়ারে বসে তালুকদার সাহেব বললেন, কেমন আছেন?
বকুল বসলেন একটা জলচৌকিতে, আছি কোনও রকম।
তারপর একটু থেমে বললেন, একটু চা করি ভাই?
না থাক।
কেন?
দুপুরের পর একটু বাগরের দিকে গিয়েছিলাম। বাগরে গেলে দুতিন কাপ চা খাওয়া হয়। আজ খেয়েছি চার কাপ।
বকুল সামান্য সময় কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, আপনরি সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হল। দু একদিনের মধ্যোআমিই আপনার সঙ্গে কথা বলতে যেতাম।
তাই নাকি!
জ্বী।
কী বিষয়ে বলুন তো!
আপনে আসছেন আমার বাড়িতে, এই সন্ধ্যায় কথাটা বলা ঠিক হবে কীনা বুঝতে পারছি না।
কী এমন কথা?
কথাটা একটু অন্য রকমই।
বলে ফেলুন। আমাদের যা সম্পর্ক তাতে কোনও বিষয় নিয়ে গড়িমসি করার কিছু নেই।

তা অবশ্য ঠিক।
বলুন তাহলে।
বলা মানে আমি আপনার কাছে একটা জিনিস চাইব।
কী বলুন তো?
তার আগে আমাকে কথা দিতে হবে আপনি আমাকে বিমুখ করবেন না।
তালুকদার সাহেব হাসলেন। এই কথাটা তো আমি দিতে পারি না।
কেন?
হয়ত এমন একটা কিছু চাইলেন আপনি যা দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।
এমন জিনিস কি আমি চাইব!
তবুও আগে আপনি কথাটা বলুন। শুনি।
আমি আপনার মেয়েটা চাই।
একথা শুনে যতটা চমকাবার কথা তালুকদার সাহেবের ততটা চমকালেন না তিনি। তবু বললেন, জ্বী?
জ্বী। আপনার আলতাকে আমি চাই।
তালুকদার সাহেব খুবই নির্বিকার গলায় বললেন, কেন?
আমার মনজুর বউ করব।
কিন্তু আলতার তো অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।
পাকা কথা তো হয়নি!
না তা হয়নি। তবে আমি ঠিক করেছি ওখানেই আলতার বিয়ে দেব।
না তা আপনি করবেন না।
তালুকদার সাহেব হাসলেন। আসি তাই করব।
জ্বী?
জ্বী। আসলে এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলার জন্যই আমি আজ আপনারদের বাড়িতে আসছি।
তার মানে ব্যাপারটা আপনি জেনেছেন?
জ্বী।
তাহলে?
তাহলে আর কী! জেনেই যে ব্যাপারটা আমি মেনে নেব, আপনি তো জানেনই অত সহজ মানুষ আমি নই।
বকুল একটু গম্ভীর হলেন। না মেনে নেয়ার কী আছে! আমার মনজু কি আপনার আলতার অযোগ্য?
না তা কিন্তু আমি বলিনি।
তাহলে?
এই ধরনের ব্যাপারকে আমি আসলে প্রশ্রয় দেব না।
কিন্তু মেয়ের মন, তার মুখের কথা আপনি ভাববেন না?
না ভাবব না।
কেন?
আমার ইচ্ছে।
কিন্তু মা বাবার তো উচিত তা ভাবা।

আমি ভাবব না।

এটা তো আপনার রাগের কথা ভাই সাহেব।

জ্বী রাগের কথা। আমি খুব রেগেছি। রেগেছি বলেই এমন নির্বিকার আর শীতল হয়ে গেছি।

তালুকদার সাহেব একটু নড়েচড়ে বসলেন। শুনুন, আমি খুব পরিষ্কার কথার মানুষ। আলতা যদি মরেও যায় এটা হবে না। মনজু যদি মরেও যায় হবে না। আমি আসলে আপনাকে বলতে এসেছি, আপনি এবং মনজু আপনারা দুজনেই আলতার চিন্তাটা বাদ দেবেন। এর বেশি আমি আপাতত আর কিছু বলছি না।

তালুকদার সাহেব উঠলেন। তারপর আস্তে ধীরে হেঁটে বাড়ির বাইরে চলে গেলেন।

বকুল তখন পাথর হয়ে আছে।